প্রবোধকুমার সান্যালের

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

আনন্দ পাবলিশার্স — কলকাতা • ১২

সূচীপত্র

ছোটগল্প

কিশোর উপন্যাস

প্রবোধ কুমার সান্যাল

উৎসর্গ

তোমাদের

বহু পাঠকের মত আমার নিজেরও একদিন একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল ছোটদের জন্য আমি বিশেষ কিছু রচনা করিনি। কিন্তু দীর্ঘ সাহিত্য সাধনার ফাঁকে ফাঁকে ছোটদের জন্য যেটুকু লিখেছি তা সামান্য হলেও তার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়।

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন ও নির্বাচন ব্যাপারে গভীর গহন রচনা-অরণ্য মন্থনে আনন্দ পাবলিশার্সের সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীশিশির সেন মহাশয় নিরলস চিত্তে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

মোট সাতটি শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প ও একটি পূর্ণাঙ্গ কিশোর উপন্যাস 'শুকনো পাতার দৌড়' এই সংকলনে দেওয়া গেল।

কলিকাতা   প্রবোধ কুমার সান্যাল

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

অভিমান

অনু আর মনু—ওরা ছিল দুই বোন। কিন্তু মনুর চেয়ে অনু অনেক বড়। অনুর বয়স যখন চোদ্দ বছর তখন মনু একদিন জন্মালো। সেদিনটা কী বৃষ্টি, তেমনি অন্ধকার,—সেটা বোধহয় শ্রাবণ মাস। আকাশ যেন সেদিন রাত্রে ওদের পুরনোবাড়ীর মাথায় ভেঙ্গে পড়তে চাইছিল। সে আর ক'দিনের কথা,—এই ত' সেদিন। মনুর বয়স এখন ছয় বছর। কিন্তু এই বয়সটুকুর মধ্যেই মনু অনেক গল্প শুনে নিয়েছে তার দিদির কাছে। দিদি তার খুব গল্প বলতে জানে। রোজ রাত্তিরে ঘুমোবার আগে দিদি তার মাথার কাছে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে ঝুড়িঝুড়ি গল্প বলতে থাকে। আর সেই সব গল্প শুনতে শুনতে মনু কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে, কিচ্ছু মনে থাকেনা। সকালবেলা উঠে মনু সব ভুলে যায়।

ওদের মা মারা গেছেন পাঁচ বছর আগে। মাকে মনুর একটুও মনে পড়েনা। সে তখন খুব ছোট্ট, এই এত্তটুকু,—মা নাকি তাকে ঝিনুক নিয়ে দুধ খাওয়াতো, মা নাকি তাকে কাজল পরিয়ে দিতো। মা যখন মারা গেল, মনু তখন একটু একটু দাঁড়াতে পারে, কিন্তু তখনও হাঁটতে শেখেনি। মনু অবাক হয়ে তার ছোট্ট-বেলাকার কাহিনীগুলো দিদির মুখে শুনতে থাকে।

ওদের দাদার নাম, দিলীপ। দিলীপ কিন্তু খুব বদ্‌রাগী।

দিলীপের পায়ের শব্দ একবার পেলেই অমনি মনু একদম চুপ। এত রাত্তির অবধি সে যে জেগে আছে, দাদা একথা শুনলে মনুর আর রক্ষে নেই। মনু চোখ-মুখ বুজে বিছানার মধ্যে মিশিয়ে থাকে, খুব আস্তে-আস্তে নিঃশ্বাস ফেলে,—সে যেন একেবারে নিঃসাড়। মনুর বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করে।

একদিন দাদা চেঁচিয়ে বললে, মনু এখনও ঘুমোয়নি? অনু ভয়ে ভয়ে বললে, হ্যাঁ…ঘুমিয়েছে…অনেকক্ষণ!

দাদা বললে, ঘুমিয়ে পড়েছে, তাহলে তুই ওর মাথার কাছে বসে আছিস কেন?

—মশা তাড়াচ্ছি দাদা!

—মশা! এ-বাড়ীতে একটাও মশা নেই তা জানিস? তুই ওর মাথাটা খাবি দেখছি আদর দিয়ে। যা, উঠে যা ওখান থেকে।

অনু বাধ্য হয়ে আস্তে-আস্তে উঠে যায়। একলা বিছানায় শুয়ে মনুর কান্না পায়। তার ঘুম আসেনা। দিদির সব কাজ সারা হলে তবে দিদি এসে শোবে তার বিছানায়। দিদিকে আঁকড়ে ধরবে এক হাতে,—তারপর দিদির গায়ের উত্তাপ পেলে তবে তার ঘুম আসবে। কিন্তু সে এখন অনেক দেরী। দাদার এখনও খাওয়াই হয়নি। দাদা যখন আপিস থেকে ফেরে তখন দাদার সঙ্গে কেউ কথা বলতে সাহস করেনা। দাদা ভীষণ রাগী।

মনু জেগে থাকে অনেকক্ষণ। বাইরের বারান্দায় হারিকেন-লণ্ঠন জ্বলছে, তারই এক ফালি আলো এসেছে ঘরের মধ্যে। মনু মাথা তুলে দেখে, তার দিদির এখনও অনেক দেরী। সবে মাত্র দাদার জন্য সে আসন পেতে দিচ্ছে। এরপর খাওয়া-দাওয়া হবে, দিদি বাসন মাজবে, ঘর ধোবে, ও-ঘরে দাদার বিছানা পেতে দেবে, বাড়ীর সব দরজা বন্ধ করবে,—এখনও অনেক দেরী। মনুর

চোখে জল আসে, কিন্তু এতটুকু গলার আওয়াজ করতে তার সাহস হয়না। দাদা একবারটি জানতে পারলে তাকে আর আস্ত রাখবেনা।

বাবাকেও মনুর মনে পড়েনা। দিদি বলে, বাবা যখন মরে গেছেন, মনুর বয়স তখন দু'বছরও হয়নি। বাবা নাকি খুব ভালো লোক ছিলেন। বাবা তাকে অনেক খেল্না কিনে দিয়ে গেছেন, সেই খেল্নার দু'একটা দিদি তুলে রেখে দিয়েছে ওই যে তাকের ওপর। বাবা নাকি একবার তার জন্যে রথতলা থেকে চার-চাকার টিনের রথ এনে দিয়েছিলেন। সেটা অনেকদিন আগেই ভেঙ্গে গেছে। এ ভারি মজা, সে যেই জন্মালো, অমনি মা আর বাবা দু'জনেই মরে গেল। দিদি ভাগ্যি মরে যায়নি!

মনুর আবার কান্না পায়। দিদি ভাগ্যি মরে যায়নি! দিদি না থাকলে কী হোতো তার! দিদি তাকে খেতে দেয়, চান্ করিয়ে দেয়, নতুন জামা তৈরী করে দেয়,—দিদি না থাকলে কে দেখতো তাকে! এখন সে নিজেই জামা পরতে পারে, নিজে-নিজেই ঘটি তুলে মাথায় জল ঢালতে পারে, কিন্তু দিদি না থাকলে তাকে খেতে দিতো কে? কে তাকে জামা দিতো? দাদা মারতে এলে কার কাছে সে আশ্রয় পেতো? সেই যে অসুখ করেছিল সেইবার,—সে-অসুখ থেকে দিদিই ত' তাকে সারিয়ে তুলেছিল। তার ক্ষিধে পেলে দিদিই ত' তাকে খেতে দেয়। দিদি তাকে কাঁচা আম, পেয়ারা, জামরুল,—সব লুকিয়ে-লুকিয়ে কিনে দেয়।

রবিবার এলেই ত' মনু ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। তার আর খেলা করাও হয়না, দিদির কাছেও সে যেতে পায়না। শনিবার রাত্তিরে দাদা বলে রাখে, কাল রবিবার। অমনি মনুর বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে। রবিবার সকালে বাজার থেকে এসেই দাদা হাঁক দেয়, মনু, পড়তে বসবি আয়।

মনুকে বই নিয়ে দাদার কাছে এসে বসতে হয়। অ আ ক খ—পড়তে গিয়ে একটু ভুল হলেই দাদা হেঁকে ধমক দেয়। তিনবার ভুল গেলেই দাদার হাতের কানমলা। কিন্তু কাঁদবার হুকুম মনুর নেই। মুখ টিপে, গলার আওয়াজ পরিষ্কার রেখে তাকে পড়া করতে হয়। দিদি যদি এসে বলে, ওকে অমন করে ধমক দিয়োনা দাদা।

দাদা আরো উঁচু-গলায় চেঁচিয়ে বলে, যা যা—তুই নিজের কাজ করগে। পড়াবার সময় মনুর সামনে তুই আসবিনে।

দিদি বলে, আমি ওকে পড়াবো, তুমি ছেড়ে দাও।
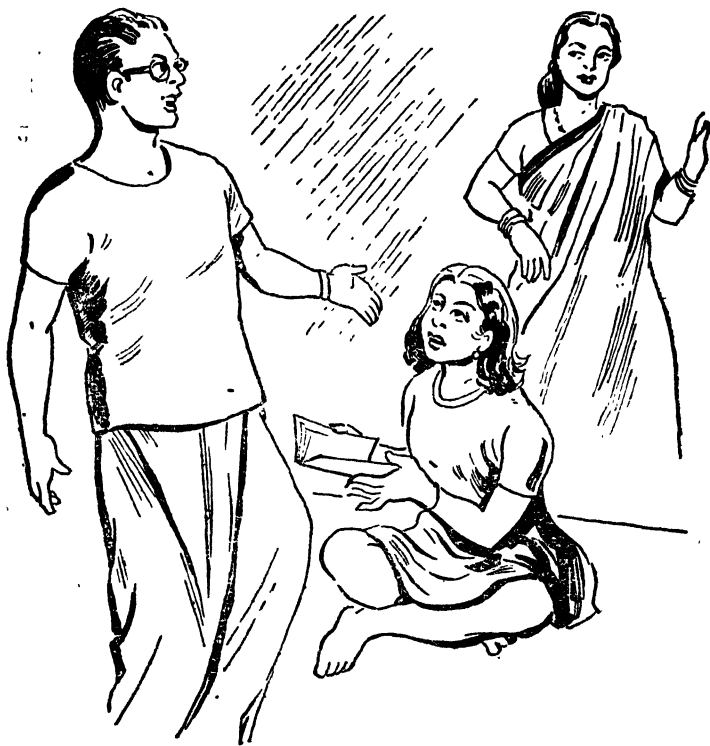
দাদা বলে, এঃ, তুই ভারি বিদ্বান···তোর কাছে আদর পেয়েই

মনু জানোয়ার হয়ে যাচ্ছে। দূর হ' তুই এখান থেকে।—কই, পড়ছিস না যে?

মনু ভয়ে-ভয়ে মাথা হেঁট ক'রে পড়তে থাকে। রবিবারটা সম্পূর্ণ কেটে গেলে তবে মনুর মুখে একটু হাসি ফোটে।

একদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মনুর হাঁটু কেটে গিয়েছিল, সেদিন তার দিদির চোখে জল দেখেছিল সে। গরম জল দিয়ে হাঁটু ধুইয়ে, ওষুধ দিয়ে বেঁধে, মনুকে কোলে নিয়ে দিদি সারাদিন কাজ করেছিল। মনুকে একটুও কোল থেকে নামতে দেয়নি।

দাদা সেই খবর শুনে বললে, একটুখানি কেটে গেছে তা হয়েছে কি? তুই যখন শ্বশুরবাড়ী যাবি তখন মনুকে এত আদর দেবে কে, শুনি? ওর মাথা খেলি যে তুই?

দাদার ধমক খেয়ে দিদি রান্নাঘরে বসে কত যে কেঁদেছিল! মনুকে ছেড়ে যেতে হবে, একথা শুনলে অনু কেঁদেই অস্থির হোতো!

কিন্তু দিদির ওই শ্বশুরবাড়ী যাবার কথাটা মনুর কানে আঠার মতন লেগে রইলো। পাশের বাড়ীর রাণু-দিদি একদিন গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ী, আর সে ফিরে আসেনি। মনুর মনে সেজন্য আতংক ছিল। তার দিদি চলে গেলে সে একা দাদার হাতে পড়ে যাবে। দাদা যেদিন চোখ রাঙ্গাবে, সেদিন মনু দাঁড়াবে কার আঁচলের তলায়? ওর বেশী ভাবতে গেলেই মনুর কান্না পায়।

কিন্তু সত্যি-সত্যিই এ-বাড়ীতে লোকজনের আনাগোনা একটু বেড়ে গেল। দিদিকে একদিন কারা যেন দেখতে এলো, দিদি সেজে গুজে গিয়ে তাদের সামনে বসে প্রণাম করলো। আর একদিন বাড়ীতে অনেক খাবার এলো, সেদিন তার দিদির পাকাদেখা। দাদা খুব ব্যস্ত। দিদির জন্যে নতুন-নতুন রেশমী শাড়ী আসে, তার সঙ্গে কত গয়না, কত রকমের জিনিসপত্র। দিদি এত

জিনিস পাবে, মন্নুর খুব আনন্দ। দিদি আড়ালে এসে তাকে আদর করে বললে, মন্নু, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবোনা।

মন্নু বললে, ওরা যে বলছে, তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে?

যদি যাই তাহলে ফিরে এসে আবার তোমাকে কোলে নেবো?

মন্নু খুব খুশী। এমন যদি হয় তাহলে দিদির বিয়েতে তার একটুও আপত্তি নেই। মন্নু বিয়েবাড়ীর আনন্দে মেতে উঠলো।

অবশেষে একদিন বর এলো বিয়ে করতে। দিদির সেদিন কী সাজ-গোছ। নতুন গয়না, দামী শাড়ী, চন্দনের ফোঁটা পায়ে আলতা। সবাই উলু দিচ্ছে, আর সকলের মুখেই হাসি। দাদা খুব ব্যস্ত। সেদিনটা রবিবার, মন্নুকে সেদিন পড়া করতে হবেনা, মন্নুর আনন্দ সব-চেয়ে বেশী।

জামাইবাবু যে হবে, কী চমৎকার সে দেখতে। দিদির মুখে মন্নু রাজপুত্তুরের গল্প শুনতো,—এও যেন সেই রাজপুত্তুর। কিন্তু বাসর-ঘরে মন্নুকে কোলে নিয়ে অনুর কী কান্না। মন্নুকে ছেড়ে সে কেমন করে যাবে, তাই জন্যেই অনু কেঁদে আকুল। অথচ মন্নু নিজে কান্নার কোনো কারণ খুঁজে পায়না। দিদি ফিরে আসবে শ্বশুরবাড়ী থেকে, সুতরাং মন্নুর আর একটুও দুঃখ নেই। মন্নু ঠিক অপেক্ষা করে থাকবে তার দিদির জন্য। তাছাড়া তার নতুন জামাইবাবু ইতিমধ্যেই তাকে কোলে নিয়ে কত আদর করেছে, কত গল্প বলেছে,—মন্নুর এমন আনন্দের দিনে দিদি কেন কাঁদে? মন্নুর আর কোনো দুঃখ নেই। তার যা পাবার, এবং তার যা জানবার তা সবই তার হাতে এসে গেছে। তার নতুন জামাইবাবু খুব ভালো! জামাইবাবু দিদিকে নিয়ে আবার ফিরে আসবে। মন্নু খুব শান্ত হয়ে থাকবে ততদিন।

পরদিন সকালে দিদিকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে জামাইবাবু এবং আর সব লোক চলে গেল। মন্নু চেয়ে রইলো পথের দিকে।

এর পর অনেকদিন চলে গেছে। মন্নু মনে করেছিল হয়ত

দুই চারদিন মাত্র,—কিন্তু এক বছর হতে চললো। দিদির চিঠি এসেছে সাত-আটখানা,—শেষ চিঠিতে অনু জানিয়েছে, শীঘ্রই আসবে সে। মনু প্রথমটা অপেক্ষা করেছিল অধীর হয়ে, কিন্তু মাস-দুই পরে সে অসুখে পড়ে। দিদি কাছে না থাকলেও অসুখ থেকে সে সেরে ওঠে। দাদা তাকে ভাত রেঁধে খাওয়ায়, দাদা আর তাকে কথায়-কথায় চোখ রাঙ্গায় না। কিন্তু আশ্চর্য, অসুখ থেকে উঠে মনু আর দিদির জন্য তেমন অপেক্ষা করেনা। মনে হয়, দিদি আর জামাইবাবু যেন তাকে অনেকটা ঠকিয়ে চলে গেছে। দিদির বদলে সে এখন অন্য আকর্ষণের বস্তু খুঁজে পায়। পাশের বাড়ীর পিসীমা, ও-বাড়ীর বড়দিদি এরা সবাই পর, কিন্তু এদের আশে পাশেই মনু সারাদিন ঘোরে। সে এখন দাদার ফাই-ফরমাস খাটে, তাকে আর লেখাপড়া করতে হয়না। মনুর দিন আজকাল এলো-মেলো ভাবে কেটে যায়। সে নাকি রোগা হয়ে গেছে খুব। তাকে যারা আগে দেখেছে, এখন তারা দেখলে আর নাকি চিনতে পারবেনা। সে এখন এত কালো আর কাহিল। কিন্তু মনুর মনে সেই ভয়ানক বিচ্ছেদের ব্যথা আর এখন নেই।

তার জামাইবাবু অনেকদূর বিদেশে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল। দিদিকেও যেতে হয়েছিল জামাইবাবুর সঙ্গে। জামাইবাবু ত' আর একা-একা বিদেশে-বিভূঁয়ে থাকতে পারেনা! দিদি সেখানে গিয়ে মস্ত ঘরকন্না পেতেছে। এমনি একটা সময়ে দিলীপের কাছে খবর এলো, দিদিকে নিয়ে জামাইবাবু কাল এখানে আসছেন।

দাদা হাসিমুখে এসে মনুকে তুলে ধরে বললে, তোর দিদি আসছে শুনেছিস্? ফর্সা জামা-কাপড় পরে থাকিস কিন্তু।

মনু শুধু বললে, আচ্ছা।

দাদা বললে, জামাইবাবুর সঙ্গে খুব গল্প করবি ত'?

—হুঁ!

কি খাওয়াবি জামাইবাবুকে মনু?

—মনু বললে, তুমি রাঁধলে ত' খাবে!

—ওরে পোড়ারমুখি, দেখিস তোর দিদিই কত রাঁধবে!

মনু ভাবলো, দিদি এসে তাকে দেখে চিনতে পারবেনা, বেশ হবে। কিন্তু সে নিজে কি দিদিকে চিনতে পারবে? দিদির মুখ-খানা তার কাছে যেন ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে।

পরদিন পাড়ার লোক সবাই দিলীপের বাড়ীর ধারে ভেঙ্গে পড়লো। অনু এসেছে তার বরের সঙ্গে। অনু-কী মোটা হয়েছে, আর কী ফর্সা! পশ্চিম থেকে এসেছে ওরা, ওরা যেন অন্য জগতের মানুষ। অনুর মাথায় সিঁদুর, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে দামী জুতো। রেশমী শাড়ী মাটিতে লুটোচ্ছে,—ওরা খুব বড়লোক। কত জিনিস পত্র ওদের সঙ্গে, কত বাক্স-তোরঙ্গ, কত বেতের ঝোলা, কত চামড়ার ব্যাগ। অনু ভিতরে এলো। প্রথমেই মুখ সিঁটকিয়ে বললে, ওমা, ঘর কী নোংরা করে রেখেছো দাদা? একটু ঝেড়ে-মুছে রাখতে পারোনি? আমরা থাকবো কেমন করে?

অনুর বর কি-যেন ইংরেজিতে মন্তব্য করলো। দিলীপ মহা লজ্জিত হয়ে নিজেই ঝাঁটা এনে ঘর পরিষ্কার করতে লেগে গেল। তার আদরের ছোট বোন এসেছে কতদিন পরে। কী আনন্দ তার।

জিনিসপত্র ঘরে তোলা হচ্ছে। দাদা বললে, মনু, ওই যে ওই বাক্সটা, তুই তুলে নিয়ে ঘরে রাখগে।

বাক্সটা ছিল বেশ ভারী, অন্তত মনুর তুলনায়। তবুও মনু সেটাকে দুই হাতে তুলে ঘরের মধ্যে আনতে গেল। কিন্তু হঠাৎ তার হাত ফস্‌কে বাক্সটা ঝণাৎ করে মেঝের উপর পড়লো। অমনি হাঁ হাঁ করে ছুটে এলো সবাই।

অনু চেঁচিয়ে উঠলো,—সর্বনাশ করলে দাদা তোমার মনু। ওর মধ্যে আমার ভালো-ভালো কাঁচের বাসন...বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই আমার এই ক্ষতি...

কিন্তু টিনের বাক্সটা পড়েছিল মনুর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ওপর। আঙ্গুলটা কেটে ঝর ঝর করে তখন রক্ত পড়ছে। দাদা তার কানটা মলে দিয়ে বললে, যা, দূর হ, এখান থেকে?

রক্তের দাগ ফেলে মনু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনু বললে, আহা, মেয়ের কী ছিরি···যেন রাস্তার ভিখিরি···অকম্মার ঢিপি! ···পা কেটে গেছে ত' যা না রাস্তায়···ঘাস চিবিয়ে পায়ে দিগে যা।

দিলীপ জলখাবারের আয়োজন করেছিল। এবার নিজেই সে রান্নাঘর থেকে অনু আর অনুর বরের জন্য থালায় সাজিয়ে নিয়ে এলো। অনু সেইদিকে চেয়ে বললে, ওসব দোকানের কচুরি-সিঙ্গাড়া উনি খান্‌না দাদা···ওতে শরীর খারাপ হয়। আচ্ছা, তুমি এত যত্নে এনেছ, উনি না হয় মিষ্টি গালে দিয়ে জল খাবেন।—ওসব তুমি বরং মনুদের দাও গে।

এই বলে স্বামীর দিকে একবার বাঁকা-চোখে তাকিয়ে অনু একবারটি চোখ টিপলো।

দাদা সমস্ত সকাল পরিশ্রম করে ওদের জন্য রাঁধলো। অনু তার স্বামীকে নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াতে বসলো। হঠাৎ দরজার পাশে মনুকে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অনু একেবারে আগুন হয়ে উঠলো। চক্ষু রক্তবর্ণ করে সে ইঙ্গিতে মনুকে খাবার সামনে থেকে সরে যেতে বললে। কিন্তু মনুকে সরে যেতে না দেখে অনু উঠে সোজা গেল রান্নাঘরের দিকে। ভিতরে গলা বাড়িয়ে চাপাকণ্ঠে ডাকলো, দাদা?

দিলীপ বললে, কি রে?

অনু বললে, মনুকে একদম জানোয়ার বানিয়ে তুলেছো? সেই থেকে হ্যাংলার মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে ওঁর খাবার কাছে? আমার যে লজ্জায় মাথা কাটা যায়!

দিলীপ হেসে বললে, তা নয় রে। ওর হাত দিয়ে আমি রমেনের জন্যে নুন পাঠিয়েছি। রমেনের পাতে নুন দেবে।

কেন, আমি কি মরেছি?—এই বলে অনু রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে এদিকে এলো। তারপর নুনের পাত্র থেকে এক খাবল্‌ নুন নিয়ে রমেনের খাবার কাছে চলে গেল।

মনু তখনও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনু তার হাত থেকে নুন কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে বললে, যা, সরে যা এখান থেকে···কী পেটের জ্বালা বাবা তোদের!

মনু সেখান থেকে চলে গেল। এ-বাড়ীতে আপাতত তার থাকার দরকার নেই, এখানে সে অবাঞ্ছিত। মনু পথে নেমে একদিকে চলে গেল।

সে যখন ফিরে এলো, বেলা তখন অপরাহ্ণ। অনুরা খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছে। তাদের ঘরের দরজা বন্ধ। মনু বাড়ীতে ঢুকলো, চোরের মতন। কেউ যেন তাকে না দেখে। কিন্তু ওধার থেকে দিলীপ হঠাৎ তাকে দেখে বললে, ওরে পোড়ারমুখি, তোর কথা যে ভুলেই গেছি রে! সকাল থেকে খাস্‌নি কিছু?

মনু বললে, না।

দিলীপ একবার অনুদের বন্ধ-ঘরের দিকে তাকালো। তারপর হেসে বললে, ভেবেছিলুম তোর দিদিই তোকে চান করিয়ে খাওয়াবে······যাক গে, আয়······পরের আশা করতে নেই, বুঝিলি মনু?

ছোট্ট বোনটিকে দিলীপ স্নান করিয়ে খেতে বসায়। যে দাদা মনুর কাছে আতংকের মতো ছিল, সেই দাদাকে দেখে মনু অবাক হয়। রান্নাঘরে উবু হয়ে বসে ভাই আর বোন যখন ঠাণ্ডা ভাত আর উচ্ছিষ্ট তরকারী খেয়ে আঁচাতে গেল, তখন রোদ পড়ে গেছে।

অনু বলে, মনু, তুই কাপড় কাচতে শিখেছিস?

মনু বলে, হ্যাঁ।

—তোর জামাইবাবুর এই রুমাল দু'খানা সাবান দিয়ে কেচে আন্‌তো ?

মনু রুমাল কেচে আনে। অনু বলে, এই নে পয়সা···গিয়ে দোকান থেকে ছুট্টে সিগারেট কিনে আন্ দেখি ?

মনু সিগারেট কিনে আনে। অনু আবার হুকুম করে—যা, চায়ের পেয়ালা ধুয়ে নিয়ে আয়। খাবারের থালাটা মেজে দে।—আর এই নে, আমার শাড়ীখানা শুকোতে দিয়ে আয়।

মনু মুখ বুজে দিদির ফাই-ফরমাস খাটে। কিন্তু আশ্চর্য, রাত্রে একা বিছানায় শুয়ে তার সেই আগেকার দিদিকে ঠিক যেন স্বপ্নের মতো আবছা মনে পড়ে। এ-দিদি সে-দিদি নয়। অথচ মানুষ কে

বদলায় এই কথাটা জানবার বয়স তার নয়। সেই বাড়ী-ঘর, সেই দিদি, সেই সে—কিন্তু কী যেন হয়ে গেছে। মনু ঠিক বুঝতে পারেনা। অনুভব করে অস্পষ্ট একটা কিছু, গলার কাছে কী যেন একটা ঠেলে উঠে আসে,—কিন্তু কী সেটা, মনু কিচ্ছু বুঝতে পারেনা।

পাশের বাড়ীর একটা মেয়ে টিপ্পনী কেটে বললে, তুই ত' তোর দিদি আর জামাইবাবুর ঝি! ওরা তোকে দিয়ে খাটিয়ে নেয়।

কথাটা শোনার পর থেকে মনুর ভিতরটা রি রি করে। কথাটা মিথ্যে নয়, ওরা ফরমাস করে, ওরা খাটায়, ওরা তাকে ঘেন্না করে। ওদের ঘরে মনুর যাবার হুকুম নেই, দিদি ওকে সরিয়ে দিয়ে তবে বাক্স খোলে, কোনো দামী জিনিস বাইরে ফেলে রাখেনা—পাছে মনু চুরি করে। কেমন একটা চাপা আক্রোশ, একটা প্রতিহিংসা—মনুর বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করে। একটা হিংস্র বিদ্বেষ,—যেমন জন্তুদের থাকে,—জন্তুরা যেমন হিংসার লক্ষ্য খুঁজে বেড়ায়,—মনুর মধ্যে সেই জিনিসটি জমে ওঠে। তার হাতের নখগুলো ধারালো হয়ে ওঠে, চোখ দুটো তার চেয়েও ধারালো। মনের মধ্যে রাগ চেপে সে এধারে-ওধারে ঘুরে বেড়ায়।

অনু বলে, এবার এসে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, দাদা।

হাসিমুখে দিলীপ বলে, কী রে?

—বললে রাগ করবেনা?

—না।

অনু বলে, ছোট-বোনটি তোমার সাধারণ নয়।

—কেন রে?

—দেখতে পাচ্ছোনা? আমার ওপর চাপা রাগ! ওইটুকু মেয়ে, কী হিংসে আমার ওপর। আমরা তোমার এখানে দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি, সেই হিংসেতে মনু আমাদের ছায়া মাড়ায়না...

দিলীপ হাসিমুখে বলে, দূর পাগল...সাত বছরের মেয়ে, ওর কি অত জ্ঞান হয়েছে?

অনু বলে, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, বুঝলে দাদা? বড় হ'লে বোনটি তোমার ডাকসাইটে মেয়ে হবে, এই বলে রাখলুম।

মন্তব্যটা দিলীপের তেমন ভালো লাগে না, সে কাজের ছুতোয় আড়ালে চলে যায়।

অমনি একটা দিনে হঠাৎ একসময় অনু চেঁচামেচি করে উঠলো সেদিন শনিবার, দিলীপ সকাল-সকাল আপিস থেকে সবেমাত্র ফিরেছে। বাড়ী ঢুকেই অনুর হাঁকডাক শুনে দিলীপ ছুটে এসে বললে, কি হয়েছে রে?

অনু চীৎকার ক'রে বললে, তোমার বোনকে সায়েস্তা করবে কিনা বলো। আমি যা ভয় করেছিলুম ঠিক তাই করেছে।

দিলীপ বলে, আবার বুঝি তোর তেলের শিশি ভেঙ্গেছে?

--তেলের শিশি? তাহলে ত সামলে নিতুম! মনু আমার সর্বনাশ করেছে! শ্বশুর-বাড়ীতে আর আমি মুখ দেখাতে পারবোনা, তা জানো?

—কেন রে?

অনু হাউমাউ করে কেঁদে বললে, চান করবার সময় আমি কানের ফুল খুলে কলতলায় রেখেছিলুম ও সেটা হাত-সাফাই করেছে!

দিলীপ বলে, এ আমি বিশ্বাস করিনে···এতটুকু মেয়ে···

বিশ্বাস করোনা?—অনু চীৎকার করে উঠলো, তবে বুঝি মনুর সঙ্গে তোমার যড় আছে? আমি কিন্তু গলায় দড়ি দেবো বলে রাখলুম, দাদা। মনু ছাড়া কেউ নেয়নি আমার কানের ফুল! ওকে আমি জানি..ওর চোখে-মুখে শয়তানি···

দিলীপ কিয়ৎক্ষণ চুপ করে দাঁড়ালো। সে কিছু করছেনা এই ভেবে অনু আবার কেঁদে উঠলো, তোমার বাড়ীতে আর আমি জলগ্রহণ করবোনা, কাল সকালেই আমরা চলে যাবো। স্বপ্নেও ভাবিনি, তোমরা ভাই-বোনে মিলে আমার মাথা হেঁট করাবে!

অনু আঁচল মুখে দিয়ে কাঁদতে বসে গেল। দিলীপ হাঁক দিলো, মনু?

মনু আড়ালে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল, এবার সামনে এসে দাঁড়ালো। দাদা প্রশ্ন করলো, তুই নিয়েছিস?

মনু বললে, না।

—ফের মিছে কথা?—দাদা এগিয়ে এসে ঠাস্ করে মনুর গালে এক ঘা চড় বসিয়ে দিলো।—বল সত্যি করে?

মনু কাঁদলোনা, শুধু বললে, আমি নিইনি!

অনু চেঁচিয়ে উঠলো, পোড়ারমুখি, হতভাগি···মুখ খসে যাবে যে তোর! তুই ছাড়া কেউ নয়, আমি ঠিক জানি!

মনু বললে, তুমি আমাকে নিতে দেখেছো?

তার উদ্ধত স্পর্ধা দাদা আর সহ্য করতে পারলোনা, পাগলের মতো মনুকে ধরে বেদম প্রহার করতে লাগলো। দিলীপের হাতের বেকায়দায় মনুর কপালের কাছটা কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে এলো। মনুর পিঠে দাগ পড়ে গেল, সর্বাঙ্গে কালশিরার দাগ ফুটলো।

কিন্তু কী শক্ত মেয়ে মনু, এতটুকু কাঁদলোনা! তার চোখে জল দেখলে এসময় যাদের মায়া হতে পারতো, সেই মা আর বাবা কবে মরে গেছে। এরা কেউ নয়, এরা বাইরের লোক,—এদের সামনে মনু চোখের জল কিছুতেই ফেলবেনা। সে কেবল বললে, আমি নিইনি।

—আমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর দিকি?—অনু চেঁচালো।

মনু বললে, তোমাকে ছোঁবোনা···আমি নোংরা···

দিলীপ স্তব্ধ হয়ে মনুর দিকে এতক্ষণ তাকিয়েছিল, কিন্তু এবার সে নিজেই চোখের জল চেপে বেরিয়ে গেল। তাকে শুনিয়ে অনু বললে, রাত পোয়ালেই আমরা চলে যাবো দাদা, বলে রাখলুম। উনি ফিরলে হয়!

* * * *

দরজার কাছে গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। জিনিসপত্র উঠছে। রমেন গাড়ীতে উঠে বসেছে। অনু দাদার পায়ের ধূলো নিয়ে বললে,

তোমার ছোটবোনের কী তেজ দেখলে দাদা? আমার মুখ দেখতে হয় পাছে, এজন্যে পাড়া ছেড়ে চলে গেছে।

দিলীপ বললে, ওসব আর কিছু মনে রাখিসনে ভাই…

মনে রেখেই বা করবো কি, মায়ের পেটের বোন ত'!—এই বলে অনু গাড়ীতে উঠে বসলো। বিদায়-সম্ভাষণের পর গাড়ী ছেড়ে দিলো।

কিছুক্ষণ পরে মনু ফিরে এলো। ওরা চলে গেছে, এবারে তার অসীম মুক্তি! মনু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচালো। তারপর এক সময় বাড়ীর বাইরে এসে একখানা চিহ্নিত-ইটের তলা থেকে অনুর কানের সেই হারানো-ফুলটি সে বার করলো, এবং আর কোনো-দিকে না তাকিয়ে সেটা আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

পূজা কনসেসন

পূজোর ছুটিতে হরিহরবাবু বিদেশে বেড়াতে যাবেন। দেড়শ' টাকার কেরানী, বিদেশে বড় একটা যাওয়া ঘটে না,—এত বড় সংসার, অতগুলি কাচ্চা-বাচ্চা। তবু পূজো কন্‌সেসন, সস্তার টিকিট, হরিহরবাবু স্থির করলেন, বাবা বৈদ্যনাথ দর্শন করতে যাবেন।

বড়বাবুকে ধরে সাহেবকে ধরে পনেরো দিনের ছুটি পাওয়া গেল। যাবার অন্তত সাতদিন আগে থেকে তোড়জোড়। যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, পরিচিত—সকলের কাছে চিঠি গেল। পাড়ার মুদির দোকান, কিনু স্যাক্‌রা, কয়লাওয়ালা, ভৃগু পরামাণিক, নটবর ধোবা—ইত্যাদি সবাই জেনে গেল, হরিহরবাবু বিদেশে যাবেন। সাতদিন আগে থেকে হরিহরের ঘুম নেই, স্নানাহারের সময় নেই। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বচসা, বাড়ীর লোকদের সঙ্গে মনোমালিন্য— তার কারণ তারা নাকি এতবড় একটা কাণ্ড-কারখানার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না।

তিনি বললেন, কোন্ দিক সামলাই? আমি এত পেরে উঠবো কেমন করে?

গিন্নি বললেন, কিসের এত হুড়োহুড়ি? এখনো ত' অনেক দেরি!

দেরি! তোমার আর কি বলো, আমার যে প্রাণ যায়। এত কেনাকাটা কে করবে?

কিসের কেনাকাটা?

শোনো কথা !—বলে হরিহরবাবু মেঝের উপর বসে পড়লেন। তিনি একে মোটা মানুষ, এতবড় ভুঁড়ি, গত বছরে অসুখ থেকে উঠেছেন, তার উপরে এই পরিশ্রম। মেয়েমানুষ, ওরা কি জানে, কতটুকু ওরা বোঝে, ওদের সাধ্য কতটুকু ? যা করে সবই ত' এই শর্মা ! হরিহরবাবু বললেন, তোমার মতন কুড়ে হলে আর রেল-গাড়ীতে উঠতে হচ্ছে না। এই বলে আবার তিনি ছুটলেন।

পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে চললেন। চীনাবাজার থেকে ছেলে-মেয়ের জুতো, হাবড়ার হাট থেকে সস্তায় কাপড়, মুর্গিহাটা থেকে গায়ের জামা, চাঁদনী থেকে দুখানা বিলেতী কম্বল। মোট ঘাট, বাজার চুপড়ি চেঙারি—সবসুদ্ধ প্রকাণ্ড এক বস্তা তিনি এনে হাজির করলেন। বিদেশে বিভুঁয়ে যাবেন, সেখানে হয়ত ডাক্তার-বৈদ্য নেই, হয়ত রাত-বিরাতে কোনো বিপদ ঘটতে পারে, এজন্য তিনি ঔষধ পত্র কিনতে সুরু করলেন। জ্বরের জন্য কুইনিন আর পল্যুড্রিন, আমাশয়ে এনটারওকুইনল, কলেরায় সালফা গ্রুপের ঔষধ, সর্দির এলকোসিন, কাসির ফেন্‌সিডিল, কাটা-ছড়ার ডেটল, ঘায়ের বোরোফ্যাক্স, জামবাক ইত্যাদি। রাত্রে পথে বেরোবার জন্য একটা টর্চ-লাইট।

সেখানে গিয়ে একটা সংসার পাততে হবে তা মনে আছে ?—হরিহর বললেন।

গিন্নি বললেন, সে ত হবেই।

তবে চুপ করে আছো কেন ? আচ্ছা, তোমার কি একটুও দুশ্চিন্তা হচ্ছে না ? জানো, সেই অজানা দেশে হয়ত কিছু পাওয়া যাবে না ?

সে তখন দেখা যাবে।—বলে গিন্নি চলে গেলেন।

পরিশ্রমে হরিহর ঘর্মাক্ত, তবু তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। ঠন্‌ঠনে থেকে তিনি এক প্রকাণ্ড চট কিনে আনলেন, তার সঙ্গে আনলেন একটা আমকাঠের বাক্স। তার মধ্যে থালা বাটি, ঘটি, গেলাস, কড়া, খুন্তি, হাতা, বেড়ি, চাটু, হাঁড়ি, গামলা, ডেক্‌চি

সব পুরলেন। সাহায্য করবার কেউ নেই, একাই সব করতে হোলো। এদিকে তেলের বাটি, মুনের কেঁড়ে, মসলার কৌটো, ঘিয়ের শিশি, শিলনোড়া, চাকা-বেলুন, বঁটি-কাটারি—সব ঢোকালেন। অতদূর—বিদেশে চাল ডাল পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, সুতরাং তেল ঘি-মুল-চাল-ডাল-লংকা-হলুদ প্রভৃতি সমস্তই তিনি কিনে আনলেন। কারো কথা তিনি শুনতে রাজি নন্, বিদেশের অভিজ্ঞতা বাড়ীর কারো নেই। এখন সবাই মুখটিপে হাসছে বটে, কিন্তু সেই দুর্দিনে এইসব বড়ই মিষ্টি লাগবে। একসময় তিনি গলা বাড়িয়ে বললেন, বলি শুনছ, ছোট ছেলেটার জন্যে কিছু দুধ নিতে হবে, সেদেশে হয়ত গরু নেই।

গিন্নি বললেন, গরু একটা এখান থেকে নিয়ে গেলে হয় না ?

বলেছ ঠিক।—বলে হরিহরবাবু মাথা নাড়লেন। যাই, ষ্টেশনে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করে আসি। বলেছ তুমি ঠিক।—তিনি গভীর চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পাড়ার 'লোক' ডেকে বললে, হরিহরবাবু, আপনার যাওয়া কি তবে ঠিক ?

হরিহর বললেন, বাবা বদ্যিনাথের ইচ্ছে, আমার ত চেষ্টার ত্রুটি নেই।

কাল রাতে আপনার বাড়ীতে অত গোলমাল হচ্ছিল কেন ?

আর ভাই, এতবড় ব্যাপার, কারো গা নেই। রাতজেগে আমি জিনিসপত্তর গোছাচ্ছিলুম।

আপনার বাড়ীতে কারা এসেছিল ?

হরিহর বললেন, ওঃ, তা বটে। এসেছিল আমার দুই শালা, বড় ভায়রাভাই আর আমার ভাগ্নে। তাদের ডেকেছিলুম চিঠি লিখে, ওরা সবাই সামনে এসে না দাঁড়ালে আমি এত পেরে উঠবো কেন ?

পাড়ার লোক বললে, আপনারা কজন যাবেন ?

আমি, আমার স্ত্রী আর তিনটি ছেলেমেয়ে। আচ্ছা, দেখুন বিনয়বাবু, আপনি একবার আসুন ত আমার ঘরে। আমার মাথার আর ঠিক নেই, দেখে যান্ ত আর কিছু দরকার লাগতে পারে কিনা ?

বিনয়বাবু এসে দাঁড়ালেন। বললেন, সবই হয়েছে, বিছানা কিছু কম।

ওই শোনো, ওগো, কোথা গেলে ? আমি তখনই বললুম। ঠিক ঠিক, সামনে অক্টোবর মাস, বটেই ত !

সেদিন সমস্তদিন হরিহর বিছানাপত্র গোছালেন। লেপ চারটে বালিস এগারোটা, কাঁথা ছ'খানা, মাদুর তিনটে, তোষক পাঁচখানা চাদর সাতখানা, সতরঞ্চি তিনখানা। এত বিছানা তাঁর নিজের ছিলনা। শালা শালী, বড়বোন, মাসতুতো ভাই, মামা, পাশের বাড়ীর বড় বৌ, বিনয়বাবুর স্ত্রী—সকলের কাছে পনেরো দিনের কড়ারে

বিছানাগুলি ধার করে এনে তিনি এক জায়গায় স্তূপাকার করলেন। জিনিসপত্র মোট-ঘাট, পোঁটলা-পুঁটলি, চুপড়ি-চ্যাঙারি প্রভৃতিতে তাঁর শোবার ঘর বোঝাই হয়ে উঠলো। রাত্রে ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ও নিজে ঘরে আর শোবার জায়গা পেলেন না, সকলকে বাইরে শুইয়ে দুদিন রাত কাটাতে হোলো। প্রথম শরৎকালের গুমোট, সুতরাং ঘরের ভিতরকার ঠাসাঠাসি জিনিসপত্রে আরসোলা, পিঁপড়ে, মাকড়সা, বিছা ইত্যাদির উৎপাতে দুদিন আগে থেকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা কঠিন হয়ে উঠলো। নীচের দালান থেকে উপরের ঘর পর্যন্ত অসংখ্য পুঁটলি, বস্তা, বাক্স, তোরঙ্গ, ব্যাগ, বিছানা, মোটঘাট ইত্যাদিতে আর পা বাড়াবার ঠাঁই রইলো না। গরুর গাড়ী না হলে এত জিনিসপত্র ষ্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে না। অবশেষে হরিহরবাবু দুখানা গরুর গাড়ী বন্দোবস্ত করবার জন্য বেরুলেন।

ফিরে যখন এলেন দেখা গেল, আবার তাঁর সঙ্গে এক গাড়ী জিনিসপত্র। সেই অজানা দেশে হয়ত খাবার জল পাওয়া যায় না, সুতরাং প্রকাণ্ড দুটো ট্যাংক এলো। বড় একটিন কেরোসিন তেল, চোর ডাকাত তাড়াবার চারটে বড় বড় লাঠি, ছ'টা হারিকেন লণ্ঠন, তিনটে আলীগড়ের তালাচাবি, পাঁচটা বালতি, একরাশ খাম-পোষ্ট-কার্ড-ডাকটিকিট, হিসাবের বড় একখানা জাবদা খাতা, গোটাকয়েক হুঁকো-কল্‌কে-তামাক-টিকে, একরাশি দড়ি,—এমনি আরো কত কি। ধামা, চ্যাঙারি, থলে, বাক্স, ব্যাগ সমস্তই একে একে বোঝাই হয়ে উঠলো।

পাড়ার বড় বৌ হরিহরের স্ত্রীকে ডেকে বললেন, এত জিনিসপত্র নিয়ে আপনারা কত দূরে যাবেন বৌদিদি ?

হরিহরের স্ত্রী হেসে বললেন, বিলাত !

অবশেষে যাবার দিন এলো। বেলা বারোটায় ট্রেন, কিন্তু আগের রাত্রে হরিহর ঘুমোলেন না। কেবল তাই নয়, পরদিন ভোরে জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করার ভয় দেখিয়ে তিনি স্ত্রীকে জেগে থাকতে

বললেন। ছেলেমেয়েদের চিমটি কেটে তিনি শেষরাত্রে ওঠালেন। গোলমাল ও চিৎকারে পাড়ার লোক সেরাত্রে জেগে কাটালো। ভোর-বেলায় একদল মুটে তুখানা গরুর গাড়ী নিয়ে এসে হাজির। সকালবেলায় নানাদিক থেকে আত্মীয়-স্বজন তাঁর দরজায় উপস্থিত। পাড়ার লোক দল বেঁধে সারি সারি উপরের জানলায় ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেল।

সকালবেলা আহারাদির ব্যবস্থা যেমন-তেমন। ছেলেমেয়েদের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার অভাবে তারা তুদিন থেকে অযত্নে ও অনাহারে কাহিল হয়ে পড়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর বিবাদ,—বিদেশ যাওয়ার এইসব হাস্যকর আয়োজনে সাহায্য না করার জন্য হরিহর স্ত্রীর মুখ দেখছেন না। যাই হোক, কোনোরকমে ভাতে-ভাত খেয়ে সেদিনের মতো কাজ সারা হোলো।

কুলিদের সাহায্যে বেলা নয়টা নাগাৎ হরিহর তুখানা গরুর গাড়ীতে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে, কপালে দইয়ের ফোঁটা এঁকে, সিদ্ধিদাতা গণেশের চরণ সেবা করে, জয় তুর্গা শ্রীহরি বলে যাত্রা করলেন। যাবার সময় তার ছোট শালাকে বললেন, আমি ষ্টেশনে গিয়ে জিনিসপত্র বুক্ করবো, তুমি ভাই গিয়ে সকলের টিকিট কাটবে। দেখো, এগারোটার মধ্যে অবশ্য পৌঁছনো চাই, পূজা কন্‌সেসনের ভিড়, দেরি হলে আর জায়গা পাবেনা।

কালীপদ বললে, কোন ভয় নেই, আমি ঠিক নিয়ে যাবো, আপনি যান।

সমস্ত পাড়া সচকিত করে, সকলকে হাসিয়ে, সকলের বিস্মিত দৃষ্টির উপর দিয়ে বাবা বৈদ্যনাথের যাত্রী হরিহর চৌধুরী মশায় আর একবার তুর্গা বলে যাত্রা করলেন। গাড়ী তুখানা পাড়ার ভিতর দিয়ে ঘটর-ঘটর করে চলতে লাগলো, আর আমাদের হরিহরবাবু তাঁর নতুন-কেনা গরুর গলার দড়িটা

ধরে সেই সকল জিনিস-পত্রের উপর বসে রইলেন। গরুটা চললো গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে।

ষ্টেশনে এসে দেখা গেল গাড়ীর তুঘণ্টা দেরি। জিনিসপত্রের যথারীতি বিধি ব্যবস্থা করে হরিহর এক জায়গায় তাঁর স্তূপাকার মালপত্রের পাশে এসে বসলেন। ক'দিন থেকে পরিশ্রমের শেষ নেই, রাত কাটে জেগে, তার ওপর মোটা মানুষ, এদিকে উপবাস চলেছে,—ক্লান্তিতে হরিহরের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো। তিনি একটা বড় মোটের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। গাড়ীর তখনও অনেক দেরী।

মাত্র কয়েক মিনিট আগে তাঁর ঘুম ভাঙলো, তখন ঘণ্টা দিয়েছে। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকাহাঁকি করতেই কুলী এলো। দশজন কুলী। সেই দশজন মিলে তাঁর মালপত্র নিয়ে প্লাটফরম পেরিয়ে গাড়ীতে তুললো! গাড়ী ছাড়তে আর বিলম্ব নেই। কিন্তু কই তাঁর স্ত্রী,

ছেলেমেয়ে, তাঁর শ্যালকরা—তারা সব কোথায়? হরিহর আকুল হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। হে নারায়ণ, মধুসূদন, তুমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো।

দুই এক মিনিট মাত্র বাকি, এমন সময় তাঁর শালা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। চিৎকার করে বললে, আপনি করেছেন কি, নামুন নামুন, এটা যে তারকেশ্বরের গাড়ী—শিগ্‌গীর, আর সময় নেই, দেওঘরের গাড়ী আর তিন মিনিট, আসুন, শিগ্‌গীর আসুন।

পাগলের মতো হরিহর প্লাটফরমে ঝাঁপ দিলেন। কুলী, কুলী! শিগ্‌গীর মাল নামাও,—এই কুলী, কুলী!

আবার জিনিস-পত্র নামাতে হোলো।

পনেরোজন কুলী, পনেরো টাকা বক্‌শিস। অনেক ভাঙলো, মচ্‌কালো, নষ্ট হোলো, হারালো। চালের বস্তা ফাটলো, তেলের টিন ফুটো হোলো, জলের কলসী ভেঙে ছত্রখান হোলো।

দেওঘরের ট্রেন ছাড়তে তখন একমিনিট বাকী। ছুটতে গিয়ে বেচারি হরিহরের কাছা খুলে গেল। সেই অবস্থায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উন্মত্ত হয়ে তিনি গাড়ী পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন। কুলীরা তখনও জিনিসপত্র এনে পৌঁছতে পারেনি। শ্যালক কেবল একটা বিছানা ও একটা কাপড়ের সুটকেস হিঁচড়ে এনে গাড়ীতে তুলে দিল। স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে গাড়ীতে তাঁকে তুলে নিয়ে বললেন, মরণ তোমার, থাক সব, তুমি উঠে এসো।

গাড়ী ছেড়ে দিল।

হরিহর ফ্যাল ফ্যাল করে গলা বাড়িয়ে চেয়ে রইলেন। শ্যালকের হেপাজতে সমস্ত মালপত্র প্লাটফরমে পড়ে রইলো।

সভাপতি

সেবার দত্তপুকুর গ্রামে যে সাহিত্য সম্মেলনটা হয়েছিল—মনে আছে ত, সেই সম্মেলনের সভাপতি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বাংলা দেশে হৈ চৈ পড়ে গেল, অত বড় সম্মেলনের একটিও যোগ্য সভাপতি নেই। সবাই বললে, রজনী বৈরাগী একজন আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক অতবড় অভিধানখানা এক মাসের মধ্যে লিখে ফেলেছে তার চেয়ে যোগ্য সভাপতি আর আছে কে?

তরুণ দল বললে—পাগল নাকি? বোরেগী হবে সভাপতি? সাহিত্যের ও জানে কি? তার চেয়ে আমাদের নটবর তলাপাত্র—ওর বিজ্ঞানের দিগ্বিজয় পড়ে দেশের কত বেকার ছেলে ব্যবসায়ে নেমেছে, ওকে সভাপতি না করলে আমরা সভা বয়কট করব।

আর একদল বললে—কিছুতেই না, তার চেয়ে বরং চিন্তাহরণ চৌধুরী সভাপতি হোক, ওর মতন কবিতা লেখে কে? বোম্বাই-এর একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিকে ওর কাব্যের দশ লাইন অনুবাদ বেরিয়েছে। ক্ষণজন্মা পুরুষ!

কিন্তু একে একে সকলের দাবি যখন বাতিল হয়ে গেল তখন বলতে একটু লজ্জা করে, আমাকেই করা হোল সভাপতি। খবরটা দৈনিক কাগজে বড় বড় হরপে ছাপা হোলো, সাহিত্যসম্রাট রসময় সামন্ত সভাপতি নির্বাচিত।

আমার ভক্তরা বললে, এই ত চাই। তুমি অতবড় ছাপাখানার মালিক, তুমি স্বনামধন্য নোটবই লেখক, তোমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কে? দেশবাসী আজ ধন্য। জয় রসময় সামন্ত কী জয়!

আমি রসময় সামন্ত, আমার পায়ে একটু বাত আছে। চোখে ভালো দেখতে পাইনে। তবু বন্ধুবান্ধব নিয়ে একদিন শুভক্ষণে ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। সঙ্গে বাতের মালিশ, কবিরাজী ওষুধের কৌটো, দোক্তার ডিবে, তামাক খাবার সরঞ্জাম, খান দুই গামছা। কোঁচানো ধুতি, পাঞ্জাবী আর মটকার চাদর জড়িয়েছি। নতুন জুতো সযত্নে তুলে রেখেছিলুম, পুরনো জুতোটাতেই কাজ চলে—কিন্তু নতুনটাই পরে এলুম। ষ্টেশনে এসে চুপি চুপি বন্ধুকে বললুম, ভাই সভাপতি হতে গিয়ে পয়সা খরচ করতে পারব না, ওরা গাড়ী ভাড়া দিয়েছে ত?

বন্ধু বললেন, তাই ত ভাবছি। কই, দত্তপুকুরের লোক ত, এখনও এসে পৌঁছল না।

বললুম, সেকি হে, তবে যাওয়া হবে কেমন করে? গাড়ী ভাড়া দেবে কে?

সকলেই মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল।

ওদিকে ট্রেণ ছাড়তে আর বিলম্ব নেই। দত্তপুকুরের দল নিরুদ্দেশ।

এদিকে আমি সমারোহ সহকারে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি, কাগজপত্রে রসময় সামন্তের খবর বেরিয়ে গেছে, চারিদিকে এত সোরগোল—অথচ গাড়ী ভাড়ার অভাবে যাওয়াই হবে না, এ বড়ই লজ্জার কথা।

এর পরের ট্রেণে যাওয়া সম্ভব নয়, ততক্ষণে সম্মেলন আরম্ভ হয়ে যাবে। তা ছাড়া বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে, আমার মতন প্রেসের মালিক হতে পারল সভাপতি, এমন সুযোগ ত্যাগ করলে হয়ত পাবো না।

চারিদিকে করুণ চক্ষে চেয়ে দেখলুম, দত্তপুকুরের একটি প্রাণীও নেই, ট্রেণ ছাড়ে ছাড়ে। সুতরাং লজ্জা আর অপমানের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমার স্যুটকেসের ভিতর থেকে গামছার খুঁট খুলে তিন

টাকা তেরো আনা বার করতে হোলো। বন্ধু টিকিট কেটে আনলেন। ক্ষুব্ধ ব্যথিত হয়ে ট্রেণে উঠলুম। আমাকে লোকে কৃপণ বলে জানে, কিন্তু সাহিত্যের জন্যে এতবড় ত্যাগ নিশ্চয়ই চিরদিন লোক চক্ষুর অগোচর থেকে যাবে। দত্তপুকুরের উপর বজ্রাঘাত হোক।

ঘণ্টা দুই পরে আমাদের ট্রেন একটা ষ্টেশনের ধারে এসে দাঁড়ালো। আমাদের কামরার সব সুদ্ধ ষোলোজন বন্ধুবান্ধব। সাহিত্য সমালোচনা আবৃত্তি, বক্তৃতা, রাজনীতি, পরনিন্দা,—সমস্তই এতক্ষণ চলছিলো। গাড়ী যখন দাঁড়ালো, বেলা অপরাহ্ণ। বন্ধুরা চা, বিস্কুট, কচুরি, সন্দেশ ইত্যাদির যোগে জলযোগ আরম্ভ করলেন। আমি বড়ই বিমর্ষ হয়ে ছিলুম কিন্তু কচুরি আর সন্দেশে মনটা একটু প্রফুল্ল হোলো। আমিও ভুরিভোজন করলুম।

সাত আট মিনিট দাঁড়িয়ে যখন আবার বাঁশী বাজলো তখন বন্ধুদের মধ্যে একটা গোলমাল শুনতে পেলুম। তিনচারটে ফেরি-ওয়ালা পয়সার জন্য তাগাদা দিচ্ছে অথচ পয়সা দেবার মানুষ নেই। আমি সভাপতি, আমিই দলপতি সুতরাং সবাই আমাকেই দেখিয়ে দিয়ে মনের আনন্দে আবার সাহিত্য সমালোচনা আর কাব্য চর্চা চালাতে লাগ্লো।

বাঁশী বেজে গেছে, সবুজ নিশান দেখা দিয়েছে—অতএব নিরুপায় হয়ে আমাকে আরো তিনটে টাকা বার করতে হোলো। দু'টাকা ন'আনা দিলেই চল্তো, কিন্তু তিন টাকা হাতে দিয়ে বাকি সাত আনা ফেরৎ পেলুম না, গাড়ী ছেড়ে ষ্টেশন পার হয়ে চলে গেল। আমার পেটের ভিতর থেকে কচুরি আর সন্দেশ ছুড়োহুড়ি করতে লাগ্লো। মুখখানা হাঁড়ির মত করে আমি বাইরের দিকে চেয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

ষ্টেশন থেকে নেমেই সামনে ছোট নদী। আমাদের সৌভাগ্য-বশত দত্তপুকুরের লোক ঘাটে উপস্থিত ছিল। তারা সবাই মিলে

আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। সাত টাকা খরচ হয়ে যাবার পর আমার মুখে আর হাসি ফুটলো না। আমি গম্ভীর মুখে সঙ্গীদের সঙ্গে নৌকায় গিয়ে উঠলুম। নৌকাটা টলতেই তাড়াতাড়িতে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লুম—আমার মট্‌কার উড়ুনিখানা জলে

কাদায় নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু রাগ করলে চলবে না, আমি সভাপতি, সকলেই আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

নদী পার হয়ে গ্রামের দিকে সবাই হেঁটে চললুম। একটা লোক হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে চল্‌লো। পথ অন্ধকার,—দুই পাশে গাছ পালার ছায়া আর শরৎকালের পথের কাদায় ধোপদস্ত ধুতি আর পায়ের চক্‌চকে জুতো কাদামাখামাখি হয়ে গেল। মাঝ পথে আবার নূতন সমস্যা দেখা দিল। লণ্ঠনে তেল ছিল না, দেখতে

দেখতে সেটা নিভে গেল, আর কোথাও আলো নেই। অতি কষ্টে অতি সন্তর্পণে কাদা মাড়িয়ে খানা-খন্দলে পা পিছলে আমরা যখন গ্রামের সাহিত্য-সভায় এসে পৌঁছলুম তখন আমাদের চোখে প্রায় জল এসেছে। সাহিত্যের জন্য বাঙ্গালা দেশে কে আর কবে এত দুঃখ সহ্য করেছে? অত রাগ দুঃখেও আমি, সাহিত্য-সম্রাট রসময় সামন্ত একটু গৌরব বোধ না করে থাকতে পারলুম না।

একখানা গোলপাতার ঘরে আমাদের থাকতে দেওয়া হোলো। তিনটি দিন আমাদের এখানে থাকতে হবে, কারণ তিনদিনের আগে এত বড় সম্মেলন শেষ হবে না। গ্রামের তিন চারজন লোক আমাদের সেবায় নিযুক্ত হোলো।

আজ রাত্রে বিষয়নির্বাচনী সভায় আমাকে সভাপতিত্ব করতে হবে। সুতরাং মুখ হাত পা ধুয়ে আহারাদি সেরে এখনই সভামণ্ডপে যাওয়া চাই। আমি আমার ঘরটাতে আমার স্যুটকেশ, কাপড়, গামছা ও জুতোজোড়া বেশ গুছিয়ে সযত্নে রাখলুম। যেমন করেই হোক, তিনটে দিন ত কাটাতে হবে।

কেরোসিনের ডিবের সামনে বসে বুকুড়ি চালের ভাত, রুক্ষু ডাল, আর অম্বল দিয়ে যখন আহার আরম্ভ করলুম তখন গা বমি বমি করে এসেছে। সকলেরই সেই আহার। কিন্তু গ্রাম দরিদ্র রাগ করব কার ওপর? আমাদের খাবার চারিদিকে সেই রাত্রের অন্ধকারে গ্রামের চাষী স্ত্রী-পুত্র পুরুষ বালক-বালিকারা ঘিরে এসে দাঁড়ালো। তাদের লোলুপ দৃষ্টির দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার আর খেতে ইচ্ছে হোলো না। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম, আর সেই মানুষগুলো জন্তুজানোয়ারের মতো আমাদের উচ্ছিষ্ট আহার্য নিয়ে চেঁচামেচি ও কাড়াকাড়ি করতে লাগলো।

ওদিকে সভামণ্ডপ প্রস্তুত, পাল টাঙানো, মঞ্চ বাঁধা, চারিদিকে আলো দেওয়া, সতরঞ্চি আর চাটাই পাতা আসন। আমি সভাপতি, সুতরাং আমার কাছেই সকলের ভিড়। কিন্তু যাবার সময় পা

বাড়াতেই দেখি আমার জুতো জোড়াটা নেই। আমি চতুর্দ্দিকে খুঁজে শেষকালে বল্‌তে বাধ্য হলুম। গ্রামের মাতব্বর নরেন চৌধুরী বল্‌লেন—যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। এইখানে রেখেছিলেন ত'? বাস্‌, তার দেখতে হবে না। শিয়াল বেটারা নিয়ে পালিয়েছে, হায় হায়—

সেই নতুন জুতোর পিছনে পিছনে আমার প্রাণটাও যেন শৃগালের সঙ্গে ছুটতে লাগলো। কিন্তু জুতো যখন গেলোই, তখন গলায় মটকার চাদর আর মানায় না, পাঞ্জাবীটাও ঘরের মেঝের উপর পড়ে গিয়ে কাদায় আর নোংরায় মাখামাখি, অগত্যা খালি পায়ে ফতুয়াটা গায়ে চড়িয়ে আমি, সভাপতি রসময় সামন্ত, সভার দিকে রওনা হলুম। মাতব্বর নরেন চৌধুরী একসময় বল্‌লেন, কত অসুবিধে হোলো আপনার, শহরের মানুষ আপনি, গাঁয়ে আসা অভ্যাস নেই,—

বল্‌লুম,—না এমন আর কী অসুবিধে। আপনাদের এত যত্ন।

চৌধুরী সবিনয়ে বল্‌লেন,—কিছুই নয়, সামান্যই আয়োজন। এ সবই আপনাদের আশীর্বাদে।

আমরা সকলেই সভামণ্ডপে এসে পৌঁছলুম। ফুল, লতা, পাতা, কাশের ডাঁটা, ঝালর ইত্যাদি দিয়ে সভাপতির আসন উঁচুতে তৈরি হোয়েছে। সমবেত জনতা চুপচাপ। কেবল একদিকে কয়েকটা উলঙ্গ ছেলেমেয়ে আর একদল স্ত্রীলোকের ভিতরে ভীষণ ঝগড়া বেধেছে। ওটুকু গোলমাল এমন কিছু নয়।

এদিকে আমাদের সভার কাজ আরম্ভ হোলো। একজন উঠে সভাপতির নাম প্রস্তাব করলেন, একজন সমর্থন করলেন। আমি যথারীতি উঠে গিয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করলুম। আমার খালি পা, ময়লা ধুতি, হাতকাটা ফতুয়া,—একটা অদ্ভুত চেহারা নিয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। আমার আশে-পাশে সব কলকাতার বন্ধু বান্ধবের দল।

সভার কাজ আরম্ভ হবার একটু পরেই একটা গোলমাল শোনা গেল। একটা লোক সহসা ভিড় ঠেলে গোলমাল বাধিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি হতভম্ব। লোকটা এগিয়ে এসে সোজা আমার কোঁচার খুঁট চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো,—গরীবের পয়সা মেরে পালিয়েছ, বাবু! মনে নেই নদীতে নৌকা পার করেছি? সাড়ে আট আনা সতেরো জনের। পয়সা যদি না দাও তো কাপড় ছাড়বো না।

সবাই হৈ হৈ রৈ রৈ করে উঠ্‌লো। সভাপতির এতবড় অপমান, মার বেটাকে। সবাই ছুটে আমার মঞ্চের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটাকে যখন মার ধোর করতে যাবে এমন সময় 'গেল, আরে-রে-রে-রে' ইত্যাদি চীৎকারের মধ্যে সভাপতির মঞ্চ কাৎ হয়ে দড়াম করে আমি সেই ভিড়ের মাঝখানে ভাঙা তক্তা, টুল, ফুলের মালা, কাঠের টেবিল, আর দড়িটড়ি জড়িয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলুম। চারিদিকে চীৎকার কোলাহল, কচি ছেলের কান্না, দুম-দাম শব্দ,—এদের মাঝখানে থেকে যখন ভাঙা তক্তা আর টুল সরিয়ে আহত অবস্থায় আমাকে তোলা হোলো, তখন আমার কপাল কেটে রক্ত ঝরছে, নাক চেপ্টে গেছে, পা খোঁড়া হয়েছে। আমি অজ্ঞান হইনি, কারণ চেয়ে দেখলুম একজন কদাকার লোক একমুঠো ঘাস মুখে চিবিয়ে আমার কপাল আর মুখের ওপর রক্ত বন্ধ করার জন্য থেব্‌ড়ে দিলে।

অত গোলমাল আর দাপাদাপিতে আলো নিভে গিয়েছিল, আর সেই অন্ধকারে নৌকার মাঝিটা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমাকে গোলপাতার ঘরে এনে শুশ্রূষা করে বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে সবাই যখন বিদায় নিল, তখন অনেক রাত। কষ্টে, অপমানে আর উৎপীড়নে আমার সর্বাঙ্গ যেন অবশ। এদিকে ভীষণ মশার কামড়ে আমি পাগলের মত একসময় উঠে বস্‌লুম। এযাত্রা পৈতৃক প্রাণটা বুঝি আর থাকে না! এই ভয়ানক সাহিত্যে

সম্মেলন থেকে কেমন করে মুক্তি পাবো তাই ভেবে আস্তে আস্তে উঠে দরজা খুললুম। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার। কিন্তু আর নয়, যেমন করেই হোক, ভোর হবার আগে এ দেশ থেকে পালাতেই হবে। হে ভগবান!

কিন্তু অন্ধকারে হাত্ড়ে হাত্ড়ে আমি আমার কোনো জিনিষ পত্রই খুঁজে পেলুম না, কাপড়জামা, সুটকেশ, চাদর—কোথাও কিছু নেই। তৎক্ষণাৎ বুঝলুম সমস্তই চুরি হয়ে গেছে, আর আমার কিছু নেই। হাতড়ে হাতড়ে দেখি, কেবল আমার গামছাখানা এক পাশে পড়ে রয়েছে। সেই গামছাখানাই কোমরে বেঁধে দুর্গা বলে সেই ভীষণ অন্ধকারে আমি পা টিপেটিপে পথে বেরিয়ে পড়লুম।

নদীর পথটা চিনে চিনে যখন অনেকদূর এসে পড়েছি তখন এক-সময় অনুভব করলুম আমার পিছনে পিছনে আসছে এক ছায়ামূর্তি। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে এলো, আমি হন্ হন্ করে এগিয়ে চললুম। কিন্তু সেই ছায়ামূর্তি আমায় ছাড়্লো না, সঙ্গে সঙ্গে নির্জন নদীর ধার পর্যন্ত এসে একসময় ডাকলে—ওহে কর্তা মশাই।

বল্লাম—কে হে তুমি?

সে কাছে এলো, বল্লে, গা ঢাকা দিয়ে পালাচ্ছো যে? ওসব হবে না, আমার নৌকাভাড়া দাও।

এ সেই মাঝি! লোকটা এখনও আমাকে ছাড়েনি, বরাবর আমার ওপর লক্ষ্য রেখেছে। বললুম, দেবো ভাই, আগে আমাকে পার করে দাও।

সে বল্লে,—ওসব হবে না। আগে দাম চাই।

আমি তার হাতে একটা টাকা দিলুম, সে বল্লে—ওসব হবে না, আর এক টাকা দাও, তোমার জন্যে আমি তখন অত মার খেয়েছি।

তার হাতে আর এক টাকা দিতে তবে সে আমাকে নৌকায় তুললে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কলকাতার গাড়ী কখন্ ছাড়ে জানো ভাই মাঝি ?

মাঝি বল্‌লে—ভোর রাতে।

আমাকে ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে পারবে ত ?

—বক্‌শিস্ পেলে পারি।

—আচ্ছা দেবো শীঘ্র চলো।

মাঝি বল্‌লে, ও সব হবে না আগে দাও। তোমাকে বিশ্বাস নেই, তখন নিরুপায় হয়ে আমার কাছে যা কিছু টাকা পয়সা ছিল, সব তার হাতে তুলে দিলুম। কেবল রিটার্ণ টিকিটখানা সঙ্গে রইল।

ওপারে গিয়ে নৌকা ভেড়াবার আগে মাঝি বল্‌লে—দাও এবারে বকশিস্।

—ওই ত দিলুম হে।

—ওটা ত ভাড়া, বকশিস্ কই? না দিলে নৌকা আমি ভেড়াবো না বল্‌ছি। এখানে গলা ফাটালেও কেউ শুন্‌বে না।

—কি চাও বলো।

—গায়ের জামাটা আর গামছাখানা—

ভীত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে জামা ও গামছা খুলে তার হাতে দিলুম। এবার মাঝি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বল্‌লে তুমি কিছু দিতে জানোনা তাই সবাই কেড়ে নিলে। যাও, উ—ই যে ষ্টেশন দেখা যাচ্ছে।

আমি সর্বস্বান্ত আর কোথাও কিছু আমার নেই। ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে মাঝির শেষ কথাটা ভাবতে ভাবতে ষ্টেশনের দিকে চল্‌তে লাগলুম।

কোকিল

আমাদের বাড়ীর উঠানে ছিল মস্ত বড় একটা বেলগাছ। গাছটা আমাদের চোখে চিরকাল রহস্য জড়ানো। তার ডাল, পালা, পাতা, ছায়া, ফুল আর ফুল,—সমস্তটা মিলে আলোয় হাওয়ায় গন্ধে রঙে সকলেরই চোখে মায়াজাল রচনা করত। আমি তখন ছোট, খুব ছোট, আমার ছোট্ট পাঠক-পাঠিকার চেয়েও শিশু। আমার বাল্যকালটা কে বলগাছের ছায়ার নীচে, ঝিল্‌মিলে বাতাসে, সুদূর আর মধুর কল্পনায়।

নানান্ দেশের নানান্ পাখী এসে বেলগাছে বাসা বেঁধেছিল। সকাল সন্ধ্যায় পাখীর কুজন। রাত্রে সেই গাছে নাম্‌ত রাশি রাশি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার আলোয় এক ব্রহ্মদৈত্য সেই গাছের পাশে পাঁচিলে পায়চারি করে বেড়াতো। চন্দন বনের গন্ধ পেয়ে ভয়ে আমরা মায়ের কোলে চোখ বুজে পড়ে থাকতুম। দিনের আলোয় রাত্রের ভয়ের কথা মনে করে আবার সবাই হাসাহাসি করতুম। বাল্যকাল ছিল সুন্দর।

বর্ষাকালের সকাল, বৃষ্টি পড়ছে না কিন্তু মেঘে মেঘে আকাশ মলিন। সূর্য সেদিন আর দেখা যায়নি কিন্তু কিছু আলোর .আভাস ছিল। আমরা ঘরের মধ্যে বিছানায় বসে কংকাবতীর গল্প শুনছিলুম। বাইরে জলো হাওয়া বইছে হু-হু করে।

এমন সময় হঠাৎ পাখীর ডানার ঝটাপটি শুনে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলুম। ফিরে দেখি আমাদের ঘরের মধ্যে একটা কালো পাখী ঢুকেছে। মেজদি বললে, ওই যে চৌকির তলায়—ওরে, একটা শালিকের বাচ্চা, সত্যি বলছি।

আমি ত একলাফে উঠে ঘরময় দাপাদাপি সুরু করে দিলুম। তৎক্ষণাৎ জান্‌লা দরজা সব বন্ধ হয়ে গেল। ভিতরে এত অন্ধকার হোলো যে, পাখী আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আলো জ্বালা হোলো। অনেক কষ্টে, অনেক গোলমাল আর দাপাদাপির পর একটা তোরঙ্গের পাশ থেকে কাপড় চাপা দিয়ে শালিক পাখীকে ধরা হোলো। ইস্, একেবারে শিশু পাখী, এখনও ঠোঁটের দুদিকে হল্‌দে দাগ, ডানাগুলি নতুন, শিশু ডানা,—পা দুটি কচি আর কোমল। এমন অসহায়, এমন পরমুখাপেক্ষী, কি আর বল্‌ব। উড়তে শেখেনি কিন্তু অবাধ্য হতে শিখেছে। আহা, বেচারি! চোখ দুটি সুন্দর আর কালো, চোখের রেখা রাঙা, মাথাটি ছোট্ট। কী ভালই লাগল। আমরা সবাই ভালোবাসলুম তাকে।

মা এলো, দাদা এলো। তখন জানা গেল, এ-ত শালিক নয়, এ যে কোকিলের ছানা! বেলগাছে ছিল কাকের বাসা, সেই বাসায় লুকিয়ে কোকিলের বউ ডিম পেড়ে গিয়েছিল, কাকেরা তা' দিয়ে ডিম ফুটিয়েছে, এ সেই ছানা। তারপর প্রবঞ্চনা ধরা পড়ে গেল, কাকেরা দিয়েছে একে ঠুক্‌রে তাড়িয়ে। কী রহস্য আমার চোখে, কী রহস্যময় বেলগাছ! ওই গাছের কোন্ অলক্ষ্য শাখার কোলে জীব-জগতের এতবড় একটা ঘটনা ঘটেছে? কে জানত বিশ্বজগৎ এমন বিচিত্র! তবে কি সমস্ত প্রকৃতির পিছনে আছে প্রকাণ্ড একটা নিয়ম? কে তার নিয়ন্তা? আমি কিছুই ভেবে কুলকিনারা পেলুম না, চোখে আমার কেবল নিবিড় বিস্ময়।

সেদিন আমার আর ঘুম এলো না।

খাঁচা এলো, খাবার এলো। বর্ষার ঠাণ্ডায় শিশুপাখীর অসুখ করবে, তার জন্য বিছানা এলো। ছাতু মেখে দেবার নতুন বাটি সংগ্রহ করলুম। তারপর আমরা সবাই মিলে লেগে গেলুম কোকিলের সেবায়। দিন রাত সেবা। তাকে খাওয়ানো, তাকে হল্‌দের জলে স্নান করানো, তার গায়ে জামা, তার পায়ে পুঁতির

মালা। বড় হলে তার জন্যে আমরা সবাই চাঁদা তুলে সোনার খাঁচা তৈরী করে দেবো। বিয়ে দেবো তার সুন্দরবনের কোকিলের সঙ্গে।

পাখী বড় হতে লাগল। এমন শান্ত আর ভদ্র পাখী আর তুটি নেই। ভয় দেখালে একটু হাঁ করে, তারপর একপাশে সরে যায়, আর কিছু না। একবেলা ছাতু, আর এক বেলা তুধকলা। রেশমের ঝালর দিয়ে খাঁচার ঢাকা তৈরী হোলো। তুবেলা খাঁচা পরিষ্কার হয়; তার সেবা নিয়ে আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পড়ে গেল। এক একজন এক একটা নাম ধরে তাকে ডাকে। স্কুলের টিফিন্ হলে তাকে একবারটি দেখে যাই, যদি সে ঘুমিয়ে থাকে তবে আর বিরক্ত করিনে।

পাখী একটু একটু করে বড় হয়ে উঠ্ছে। বেশ বড় হোলো। নধর আর মোটা সোটা। আর তার শৈশব নেই। তার ডানা তুটো বেশ তুরন্ত হয়ে এসেছে। একবার ছাড়া পেলেই সে নীল আকাশের দিকে ছুটে চলে যেতে পারে।

বেলগাছের ওপাশে ছিল বোসেদের ব্যড়ী। তাদের বাড়ীতে নানারকম পোষা পাখী আছে,—মনুয়া, হীরামন, কাকাতুয়া, ময়না, এমন কি বিলিতি মুরগি পর্যন্ত। নেই কেবল কোকিল। কোকিল বাড়ীতে থাকা একটা গৌরব। আমাদের একটি মাত্র কোকিলের কাছে তাদের সমস্ত পাখী ম্লান হয়ে গেছে। বোসেদের বাড়ীর পাখীগুলো যখন-তখন ডাকে, কাকাতুয়ার কণ্ঠস্বর এতদূরে আমাদের বাড়ী থেকেও শোনা যায়। কিন্তু আমাদের কোকিল যেদিন ডাকবে সেদিন সকল পাখীর ডাক ভেসে যাবে, তুচ্ছ হয়ে যাবে। কোকিল ডাকলে গাছপালা আর আকাশের চেহারা পর্যন্ত বদলে যায়। আমাদের প্রিয়তম কোকিল একদিন ডাক্‌বে!

মামা এলেন দূর দেশ থেকে। কোকিলকে দেখে তিনি বললেন, এখনো ডাক্‌তে শেখেনি? সেকি রে, এ তবে বোবা!

কেন? আমরা বললুম।

এর চেয়ে অনেক ছোট কোকিল ডাকে, না ডাকলেই বুঝবি বোবা

বললুম, এর এখনো ডাকের বয়স হয়নি। বাড়ন্ত গড়ন কিন্তু বয়স খুব কম, মামাবাবু।

দূর বোকা, এই বয়স থেকেই ডাকে। নিজের পাখী বলে ওর দোষ ঢাকিসনে। পাখা তোদের নিশ্চয় বোবা।

তারপর অনেকদিন চলে গেল। কোকিল আর ডাকেনা। সেবা যত্নের ত্রুটি নেই। সকালে গরম, ভাত, দুপুরে দুধকলা ; ওবেলায় ছাতু। যখন তখন দুধকলা আর ছাতু। পাখী খুব খায়। ফল মুল, লংকা—আরো কত কি। খেতে দিলেই খায়, তার আপত্তি নেই। খেতে খেতেই তার দিন যায়। খেয়ে সে খুশি হোক, ডাকুক। যেদিন ও ডাকবে সেদিন আমাদের জীবন হবে সার্থক। ডাকো পাখী, লক্ষিমটি, ডাকো ত ভাই,—কু-উ, কু-উ, কু-হু হু।

দিনের পর দিন গেল, পাখী আর ডাকল না। তাকে এমন প্রাণপাত করে মানুষ করেছি, সে কোনো প্রতিদান দেয় না। যে আসে সেই পরীক্ষা করে দেখে বলে যায়, তোদের বোবা কোকিল তাড়িয়ে দে বাড়ী থেকে।

হায় রে, এত কষ্টে যাকে মানুষ করলুম, অকর্মণ্য বলেই কি তাকে তাড়াতে হবে? যদি নাই ডাকে তবে কি তার কোনো দাম নেই। প্রতিদান দিতে পারল না বলেই কি একটা জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে? বড় দুঃখে ও ব্যথায় আমাদের দিন যেতে লাগল! আমরা সবাই মিলে তাকে ঘিরে বসে হা-হুতাশে করতে লাগলুম। মা আর দাদারা বললেন. এমন অকেজো নচ্ছার পাখীকে দূরে করে দাও, উড়িয়ে দাও শূন্যে, চলে যাক যেখানে খুশি।

ভয়ে কেঁপে উঠতুম। কেমন করে ছাড়ব একে? এ আমাদের শিশুজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ছেড়ে দিলে অভিমান করে চলে যাবে, কিন্তু কোথায়? কোন্ দিকে যাবে? পথ ত চিনতে শেখেনি? যদি উপবাসে থাকে! না, তা আমরা পারব না।

কোকিলের বিরুদ্ধে সবাই শত্রু হয়ে দাঁড়াল। সে যেন দু-চোখের বিষ। বাড়ীর সবাই তাকে গালাগালি দিতে লাগল, সে অকর্মণ্য, সে বোবা, সে কেবল গৃহস্থের অন্ন ধ্বংস করছে। সকলে যতই তাকে অনাদর করে, ততই আমাদের মমতা বেড়ে যায়। আমরা তাকে সমস্ত ঝড়-ঝাপ্টা থেকে আগলে রাখি। সে

যেন আমাদের পরমাত্মীয়। একটি বার যদি সে ডাকে তবে আমরা ধন্য হই, কৃতার্থ হই, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি। কিন্তু কোকিল আর ডাক্‌ল না, মুখের একটি শব্দ পর্যন্ত করল না। দিনে দিনে আমরা হতাশ হয়ে গেলুম।

একদিন সমস্ত বাড়ীতে অসন্তোষ ঘনিয়ে উঠ্‌ল। আমরা নিরুপায় হয়ে ঠিক করলুম, বোসেদের বাড়ীতে তাকে দিয়ে আসব। তাদের অনেক পাখীর সঙ্গে আমাদের বোবা কোকিলটাও থাকুক। আমাদের বাড়ীতে আর তার ঠাঁই নেই। কোকিলকে আমরা তাড়িয়ে দিয়ে আসব শুনে সবাই আনন্দিত হোলো। বললে, খাঁচাসুদ্ধ বালাইকে বিদায় করে দাও।

তথাস্তু। ছোট বোন কাঁদতে লাগল। তার সুমুখ দিয়ে আমি

খাঁচাসুদ্ধ কোকিলকে নিয়ে চললুম। পরম প্রিয় আত্মীয়কে আজ চিরনির্বাসন দিয়ে আসব। গলার মধ্যে আমার কান্না জমে উঠেছে।

বোসেদের বড় ছেলের হাতে খাঁচাটা দিয়ে আমি ঘরে ফিরে এলুম। বাড়ীটা যেন আমাদের শ্মশান, প্রিয়জনের বিচ্ছেদে আমরা শিশুর দল সবাই মুহ্যমান।

তারপরে আবার বৃষ্টি নাম্‌ল। মেঘের উপর দিয়ে মেঘ এলো ছুটে। জলের হাওয়া এলোমেলো ছুটোছুটি করতে লাগল। আমাদের বেলগাছটা অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মতো তপস্যায় বসে রয়েছে। সেই কোকিলের বাসাটা ঝড়ে ঝাপ্‌টায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি, চারিদিকে বর্ষা, গাছের পাতায়, ছায়ায় বর্ষা, আমাদের ঘরে, বিছানায়, দেয়ালে, আমাদের মনে, আমাদের সকল কাজে বর্ষার প্লাবন নেমেছে। তিনদিন অবিশ্রান্ত অক্লান্ত জলপ্লাবন।

সেদিন প্রভাতে আকাশ প্রসন্ন হোলো। শোক আর দুঃখের কান্নার পর যেন আকাশ একটু শান্ত হয়েছে, মুখে ম্লান হাসি ফুটেছে। সেদিন আমাদের স্কুলের ছুটি—ভোরবেলা গায়ে ঢাকা দিয়ে গরম বিছানায় শুয়ে আছি।

এমন সময় তীব্র শীর্ণ দীর্ঘ তান কানে এলো—কু-উ, কু-উ, কু-হু-হু!

লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলাম। কোকিলের চিরপরিচিত কণ্ঠ!

উঠে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আবার সেই সুন্দর কণ্ঠস্বর কানে এলো। আমরা দিশাহারা, আমরা পাগল! তৎক্ষণাৎ পাগলের মতো ছুটলুম। আমার গলার ভিতর দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে।

বোসেদের বাড়ীর উঠানে এসে দেখি, আমাদেরই খাঁচায়

আমাদেরই প্রিয় কোকিল আর একবার ডাকল, কু-উ, কু-উ, কু-হু-হু। ওরে বিশ্বাসঘাতক, ওরে অধার্মিক, ওরে প্রবঞ্চক,—অজ্ঞান পাখী বলেই কি ভগবান তোকে ক্ষমা করবেন? আমার চোখ ফেটে জল এলো।

বোসেদের ছোট ছেলেকে বললুম, তাহলে বোবা নয়, কি বলিস?

সে বললে, পাখী কখনও বোবা হয় রে?

তোদের এখানে এসে ডাকল কেন?

সে হেসে বললে, অল্প খেতে দিতে হয়। কাছে কাছে কখনো থাকতে নেই। তোরা পাখী পুষতে জানিসনে।

বললুম, অল্প খেতে দিতে হয় কেন?

সে বললে, ক্ষিদে না পেলে কি পাখী ডাকে রে?

তাই বটে। উপবাসে না থাকলে, দরিদ্র না হলে বোধহয় মানুষেরও গুণপনা প্রকাশ পায় না। ক্ষুধাই প্রতিভা বিকাশের মূল। বললুম, আমাদের পাখী দিয়ে দে।

সে বললে, ইল্লি! ভাগ্ এখান থেকে।

ভগ্ন হৃদয় নিয়ে চলে এলাম। এমন আত্মগ্লানি, এমন চিত্ত-দাহ—দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে হোলো। কেন তাকে যত্ন করেছিলাম কেন তাকে রাখিনি উপবাসে! এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা যে করতে পারল, পৃথিবীর সবাই তার গুণের প্রশংসায় মুখর? রাত্রে বিছানায় শুয়ে আমার শিশুমন কাঁদতে লাগল।

দিনরাত কোকিলের ডাক শুনি। পাড়ার সবাই শোনে—কু-উ, কু-উ, কু-হু-হু! বাড়ীর সবাই তাকে গালাগাল দেয়। আমার বুকের ভিতরটা জ্বালা করতে থাকে, তার গলার আওয়াজটা যেন সর্বশরীরে কাঁটা ফুটিয়ে দেয়। যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে উঠি। ঘর ছেড়ে মাঠের দিকে চলে যাই। পৃথিবীর সবাই নিষ্ঠুর, পৃথিবী মিথ্যার ভরা।

দিন কয়েক অবিশ্রান্ত তার সেই মধুর কণ্ঠস্বর শুনতে লাগলুম। মধুর কিন্তু মনে হোলো, বিষাক্ত কণ্ঠ। কোকিল যেন আমাদের বিদ্রূপ করছে। তাকে অত যত্ন করেছি, তাই সে করছে পরিহাস।

একদিন আর তার ডাক শুনতে পেলুম না। বিদ্রূপ করে করে সেও ক্লান্ত হোলো। বোধ হয় তার লজ্জা হয়েছে। দিন দুই উৎকর্ণ হয়ে রইলুম কিন্তু তার সাড়া নেই। সেদিন তাকে দেখতে গেলুম বোসেদের বাড়ী। বড়লোকের বাড়ীতে থাকতে পেয়ে এবার বোধ হয় সে ক্ষুধা ভুলেছে।

গিয়ে দেখি, খাঁচাটা খালি; পাখী নেই। চাকরের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল, আমার প্রিয় কোকিল পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। একদিন কি হোলো কে জানে, সকাল বেলা উঠে দেখা গেল, খাঁচার ভিতরে তার মরা দেহটা পিঁপ্ড়েরা খুবলে খাচ্ছে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালুম। তবে কি বালকের মনোবেদনা ভগবানের বুকেও বেজেছিল? কিন্তু তাকে শুধু অভিশাপ দিয়েছিলুম, মরতে ত বলিনি! আমার অভিমানই কি আমার প্রিয়র মৃত্যুর কারণ?

চোখে জল নিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম।

।ফি।৫

ভোটরঙ্গ

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচন,—চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। শহরের নাড়ি দ্রুত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাস্ ছুটছে, মোটর ছুটছে, ঘোড়ার গাড়ী ছুটছে,—হাজার হাজার ক্যান্‌ভাসারের দল প্রানের দায়ে আপন আপন প্রভুর ভোটের জন্য ছুটোছুটি করছে। বেকারের দল কাজ পেয়েছে, পয়সা পাচ্ছে। রাস্তায় ঘাটে শ্মশানে বাজারে লক্ষ লক্ষ প্লাকার্ড পড়েছে,—অমুককে ভোট দিন্। অমুক আপনার শ্রীচরণের সেবক, মনে রাখবেন। অমুক আপনার দাসানুদাস, ভোলেন-নি ত? অমুককে ভোট দিয়ে কংগ্রেসকে বাঁচান্। অমুককে ভোট দিয়ে দেশের ও দশের কল্যাণ করুন—ইত্যাদি। মোটরের পিছনে, বাসের পিছনে, গাড়ীর পিছনে নানান্ জাতের পোষ্টার লাগানো। কেবল ভোট দাও, ভোট দাও। কেউ গাড়ী চাপা গেল, কেউ মারামারি বাধালো, কেউ ধরা পড়ল পুলিশে, কেউ বা কারুর মাথায় হাত বুলিয়ে বসলো। বাস্তবিক, এই সময়টায় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণের মধ্যে যে পরিমাণ জাল জোচ্চুরি, মিথ্যাকথা, ধাপ্পাবাজি, স্বার্থপরতা, হিংসা দেখা যাচ্ছে এমন আর কখনো দেখা যায় না।

'মশাই অমুক লোকটা অমুক লোকটাকে নিশ্চয় হারিয়ে দেবে, কি বলেন?' 'আপনি অমুককে ভোট দিচ্ছেন ত? নিশ্চয়ই দেবেন, উনি খুব জনপ্রিয়।'

'অমুককে কদাচ ভোট দেবেন না, দেশের শত্রুতা করা হয়! জানেন ত, লোকটা গোপনে গভর্ণমেণ্টের টাকা খায়?

'আপনার পায়ে পড়ি মশাই, রসিক চৌধুরীকে দয়া করে একটি ভোট্ দিন, তিনি আপনার পায়ের জুতো।'

'কই, তাঁর নাম শুনিনি ত?'

'শোনেন-নি? আশ্চর্য, অবাক করলেন আপনি! আপনি বাংলা দেশে বাস করেন ত? অথচ তাঁর নামটা আপনার কানে ওঠেনি? অত বড় বড় দুটো কান আপনার! আশ্চর্য, রসিক চৌধুরী দেশের এত বড় একটা মাথা, চিরকাল নিঃশব্দে দেশের কাজ করে এল, সর্বস্ব যে আপনাদের জন্য বিসর্জন দিলে, আজ তার নামটাও ভুলে যান আপনারা? হায় পরাধীন জাতি, হায় দেশ··· দয়া করে তাঁর নামে ভোটটা দেবেন ত?'

কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ভোট, ভোট, ভোট। সিনেমায় ভোট, রেডিওতে ভোট, খেলার মাঠে ভোট। শেষকালে ভোট-ক্যান্‌ভাসারের দল দেখলেই লোকেরা ছুটে পালাতে লাগল, পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে গৃহস্থরা বাড়ীর দরজা বন্ধ করতে সুরু করল। ইন্‌স্যুয়রেন্স ক্যান্‌ভাসার আর ভোট ক্যান্‌ভাসার—এদের দৌরাত্ম্যে কল্‌কাতায় আর বাস করবার উপায় নেই।

আমাদের পাড়া থেকে রসিক চৌধুরী মশাই এবারে কাউন্সিলর হবার জন্য দাঁড়িয়েছেন। কাগজে কাগজে তাঁর বিজ্ঞাপন, বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে তাঁর গুণগান। তিনি যে এত বড় একজন দেশহিতৈষী এবং সমাজসেবক এর আগে কেউ জানত না। লোকটার অবস্থা এমন কিছু ভালো নয়। হঠাৎ সখ হলো, তিনি কাউন্সিলর হবেন। পাড়ায় পাড়ায় খবর পৌঁছলো, অনেকগুলো বেকার ছোকরা তাঁর জন্য ভোট আদায় করতে বেরুলো। রসিকবাবু খান চারেক ভাড়াটে মোটর আনালেন। ঘুষ এবং তোষামোদের দ্বারায় অনেক মুরুব্বি জোগাড় করলেন। নিজে হাতজোড় করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে বেরুলেন। তিনি যে এমন সদালাপী, সচ্চরিত্র এবং ধার্মিক একথা কি এর আগে এমন করে কেউ জানত? এই

সুযোগে অনেকে তাঁকে ভোট দেবার নাম করে কিছু টাকা আদায় করতে লাগল। তিনি সবিনয়ে বলে বেড়াতে লাগলেন, আমার যথাসর্বস্ব ত আপনাদেরই জন্যে! আমি আপনাদের গোলাম!

এই গোলামটি আগে সাহেব সেজে সকলের উপরে টেক্কা দিয়ে বেড়াত, কিন্তু লোকটার ভালমানুষী দেখে অনেকেই বললেন, আচ্ছা আপনাকেই ভোট দেবো।

হাতে যে কয়েকদিন সময় ছিল তা ক্যান্‌ভাস্‌ করতে করতেই খরচ হয়ে গেল। আগামী কাল ভোট গণনার দিন। রসিক চৌধুরীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন রতন পাল। একই জায়গা থেকে দুটি লোক পাল্লা দিচ্ছেন। রতন পালের অবস্থা খুব ভালো, পাটের দালালিতে বড়লোক, অনেক টাকা, অনেক ক্যান্‌ভাসার, অনেকগুলি মোটর। লোকটা ঘুষ ছড়িয়েছে চারিদিকে। একজন বিখ্যাত কংগ্রেস নেতাকে ঘুষ খাইয়ে প্রশংসাপত্র আদায় করেছে। বহু লোকের ভোট সে পাবে। তার ক্যান্‌ভাসাররা চীৎকার করতে করতে মোটর ছুটিয়ে যায়, তার নামে পাড়ায়-পাড়ায় গানের দল, কাগজে কাগজে তার ছবি।

এদিকে রসিক চৌধুরীও বেশ খরচ করছেন। ব্যাংকে তাঁর কিছু টাকা ছিল, সেটা তুলে আনিয়েছেন, বাড়ীখানা এক মাড়োয়ারির কাছে বন্ধক রেখে মোটা টাকা ধার করেছেন—ওই রতন পাল, পাটের দালাল, ওটাকে হারাতেই হবে। রসিকচন্দ্র তাঁর ক্যান্‌ভাসারের দলকে বাড়ীর মধ্যে ডেকে বিরাট ভোজের উৎসব লাগিয়ে দিলেন। বাড়ীতে যেন ভূতের উপদ্রব সুরু হয়ে গেল। গত কয়েকদিন ধরে তিনিও খবরের কাগজওয়ালাদের ঘুষ পাঠাচ্ছিলেন। বড় বড় ছবি তাঁর ছাপা হয়েছে, বড় বড় অক্ষরে প্রশংসা! দেশের লোক স্তম্ভিত হয়ে যেতে লাগল, তারা জানত না বাংলা দেশে এতগুলি মহৎ ব্যক্তি রয়েছেন।

পাড়ায় হৈ চৈ কাণ্ড। গৃহস্থদের চোখে ঘুম নেই। রতন পালের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে রসিক চৌধুরীর বাড়ীর মেয়েদের ঝগড়া বাধল। এ-বাড়ীর পুরুষদের সঙ্গে ও-বাড়ীর পুরুষদের মারামারি লেগে গেল। ও-বাড়ীর একটা ছোট ছেলে এ-বাড়ীর একটা ছেলেকে ঢিল ছুড়ে মারল। রসিক চৌধুরী পুলিশ ডাকতে

ছুটলেন, কিন্তু রতন পালের কারসাজিতে পুলিশ এসে পৌছল না। ক্যানভাসাররা খুব চালাক লোক, তারা এই সুযোগে দুই পক্ষ থেকেই টাকা আদায় করতে লাগল। রসিক চৌধুরীর লোক গিয়ে গোপনে টাকা খেয়ে রতন পালের কাজ করতে লাগল এবং রতন

পালের ক্যানভাসাররা গোপনে রসিকের কাছে টাকা নিয়ে রতন পালের শত্রুতা করতে লেগে গেল।

কে হারে কে জিতে—এই নিয়ে জটলা, এই নিয়ে আন্দোলন। পাড়ায় চায়ের দোকানটার অবস্থা ফিরে গেল, খাবারের দোকানটা ফেঁপে উঠ্‌ল, মোটরওয়ালারা ব্যাংকে টাকা জমা দিতে লাগল। ভিখারীরা পয়সা পেয়ে রসিক চৌধুরীর নামে ছড়া বেঁধে চারিদিকে প্রচার করতে লাগল। কেউ চীৎকার করছে, রসিক চৌধুরী কী জয়। কেউ বলছে, ভোট ফর্‌ রতন পাল—হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে! বন্দে মাতরম্‌, মহাত্মা গান্ধী কী জয়!

আশ্চর্য রতন পালের কাণ্ড কারখানা। তার পক্ষ থেকে অদ্ভুত ভাবে প্রচার কার্য করা হয়েছে। সকলের মুখেই 'রতন পাল।' সম্ভবতঃ সে-ই বেশি ভোট পাবে। লোকটা অগাধ টাকা খরচ করেছে। পাটের দালালের পাটোয়ারি বুদ্ধির কাছে এইবার বুঝি রসিক চৌধুরী হার মানল। হে ভগবান, তুমি রক্ষা করো। লোকটা যেন আজ রাত্রেই ওলাউঠায় মারা যায়।

কিন্তু রতন পালকে মারে কার সাধ্য। তার বাড়ীর চতুর্দ্দিক লোকে লোকারণ্য। তার চেয়ে বড় দেশপ্রেমিক জগতে আর কেউ নেই। বহু গৃহস্থকে সে টাকা দিয়ে বশ করেছে। সে সব লোক কি আর বিশ্বাসঘাতকতা করবে? রতন পাল এক এক পরিবারের সকলের পায়ের জুতো কিনে দিয়েছে। বলেছে, ওই জুতো আমার গায়ের চামড়ায় তৈরী, তোমরা আমায় পায়ে রেখো বাবা।

রসিক চৌধুরী পাগলের মতো আলুথালু হয়ে ছুটছে। তার স্নানাহার বন্ধ। এইবার তার বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়বে। আর বুঝি তার জয় হোলো না। তার যথাসর্বস্ব গেছে, নগদ টাকা আর নেই। বাড়ীতে হাঁড়িচড়া বন্ধ। আগামী কাল ভোট গণনা হবে। তার পক্ষের অবস্থা খুব খারাপ। রতন পাল জিতলে সে আর সংসারে থাকবে না, গেরুয়া চড়িয়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে। সে বিষ

খাবে, গলায় দড়ি দেবে, জলে ডুবে মরবে, ট্রেণের লাইনে গলা পেতে দেবে, নিজের পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলবে।

ভয়ে তার সন্ধ্যাবেলায় জ্বর এলো, চোখ লাল হোলো, তবু তার পায়চারি থাম্‌ল না। লোকজন তার জন্যে প্রাণপণে পরিশ্রম করছে, ঢ্যাঁড়া পিটোচ্ছে, চীৎকার করছে, ভোটারদের পায়ে গিয়ে শুয়ে পড়ছে। পথের লোক ধরে কান্নাকাটি লাগিয়েছে। তবু আর আশা নেই, রতন পালের পক্ষে অনেক বেশি ভোট, তার কানে সন্ধ্যার পর খবর এলো। এবার নিশ্চিত অধঃপতন, নিশ্চিত মৃত্যু। এ সংসার বড় নিষ্ঠুর, মানুষ বড় কুটিল। এ জগতে সে আর থাকবে না।

সন্ধ্যার পর বাড়ীতে হরিনাম সংকীর্তনের দল এলো, তারা খোল-করতাল বাজাতে লাগল! প্রার্থনা করতে লাগলো, যেন, রসিক চৌধুরীর জয় হয়। কিন্তু আবার রাত্রে কানে এলো জয়ের আশা নেই। রসিকচন্দ্র হাতের কাছে আর কিছু পেলেন না, গৃহিণীর কাছে গহনাগুলি চেয়ে নিলেন। অনেক টাকার গহনা, সোনার দর চড়েছে, অতএব তৎক্ষণাৎ সেগুলি বিক্রয়ের জন্য বাজারে লোক পাঠালেন।

টাকা এলো। রসিকচন্দ্র ক্যান্‌ভাসারদের মধ্যে আবার টাকাগুলি মুড়ি-মুড়কির মতো ছড়িয়ে দিলেন। আর টাকা নেই, শেষ পুঁজি খরচ হয়ে গেল।

সমস্ত রাত প্রলাপ বকে কেটে গেল। বেহুঁস জ্বর। পরণের কাপড় চোপড়ের ঠিক নেই। মাথায় প্রবল যন্ত্রণা। এক জায়গায় শুতে পাচ্ছেন না, অস্থির হয়ে সারা বাড়ীময় ছুটে বেড়াতে লাগলেন। সকাল বেলা তাঁর কাছে আবার খবর এলো, ভাগ্য বিরূপ, এত করেও জয়ের আশা নেই। পাটের দালালের কাছে ব্রাহ্মণ সন্তানের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

ভাইত, দেশে কি ধর্ম নেই? দেশে কি জীবে দয়া নেই?

ব্রাহ্মণত্ব কি একেবারে লোপ পেয়েছে? রসিক জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকালেন। আজ তিনি চোখের আগুনে সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন।

পাড়ার চারিদিকে তাঁকে বিদ্রূপ করে চীৎকার উঠল, জয়, রতন পাল কী জয়!

পাগল করবে এরা, এরা অপমান করবে! অসহ্য, অসহ্য। পরাজয়ের কলংক, পরাজয়ের লজ্জা। ভোট গণনার আগেই তিনি বিষ খাবেন। মরবার সময় বলে যাবেন, রতন পালের লোক তাঁকে বিষ খাইয়েছে। রতন পালকে যেন পুলিশে গ্রেপ্তার করে।

আবার চীৎকার উঠল, রতন পাল কী জয়! আর মাত্র ঘণ্টা দুই বাকি। রসিক চৌধুরী মরিয়া হয়ে তাঁর উড়িয়া চাকরকে ডাকলেন, জগবন্ধু?

জগবন্ধু এসে দাঁড়াল। তিনি বললেন, গোয়াল থেকে শাদা গরুটা বার কর ত বাবা?

জগবন্ধু গিয়ে গোয়াল থেকে শাদা গরুটার দড়ি ধরে বার করে নিয়ে এলো। গরুটা ভয়ানক দুরন্ত। শিং নাড়া দিতে লাগল।

বাড়ীর একটা ছেলেকে রসিক বললেন, ওরে কেষ্টা, আলকাৎরা দিয়ে গরুটার গায়ে লেখ্, আমি যা বলি।

তথাস্তু। আল্‌কাৎরা এনে গরুর গায়ে লেখা হোলো, 'রসিক চৌধুরীকে ভোট দিন্'। তারপর সকলের মাঝখান দিয়ে দড়ি ধরে গরুটাকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে গিয়ে পথের ভিড়ের ভিতরে ছেড়ে দেওয়া হোলো।

দুষ্ট দুরন্ত গরু, লোকজন দেখে ভয়ে পা তুলে লাফাতে লাফাতে ছুটলো। তার বাঁকা শিং দেখে রাস্তার লোকজন চীৎকার করতে করতে কে কোথায় কার ঘাড়ের উপর দিয়ে পালাতে লাগল তার ঠিক নেই। কিন্তু গরুর গায়ের লেখাটা সবাই একবার করে পড়লো,

'রসিক চৌধুরীকে ভোট দিন্'। গরুটা দিক-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে হাম্বা হাম্বা রবে ছুটছে।

চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। হাঁ, রসিক চৌধুরী মানুষ বটে, কর্মী বটে, কাউন্সিলর হবার যোগ্য বটে! সবাই বলে উঠ্ল, রসিক চৌধুরী কী জয়।

আশ্চর্য, অবাক্ কাণ্ড! ভোট গণনায় রসিক চৌধুরীর জয় হোলো। অদ্ভুত জয়, তার পক্ষে অনেক বেশি ভোট। পাটের দালাল রতন পাল গেল তলিয়ে, যাদের পায়ে রাখতে বলেছিল, তারা তাকে পায়ে দলে চলে গেল। কপাল জোর বটে রসিক চৌধুরীর।

রসিকচন্দ্রের জয় হোলো বটে কিন্তু সর্বস্বান্ত! চাল কেনবার আর পয়সা নেই, যা কিছু সব গেছে। দেনার দায়ে মাথার চুল বিক্রি!

কিন্তু রতন পালকে হারাতে পেরেছে, এতেই সে খুসি। ভাগ্যি, গরুটা ছিল !

কাউন্সিলর রসিক চৌধুরীর নাম উঠ্‌ল কাগজে-কাগজে। চারদিক থেকে তাঁর কাছে অভিনন্দন আসতে লাগল। তাঁর মতো দেশকর্মীর জয় ত হবেই।

কিন্তু সেই গরুটার খোঁজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকে বলে, কল্‌কাতার কোনো কোনো পথে এমনি একটা গরু মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় বটে। যে গরু অমন বিপদে বাঁচিয়েছে তাকে ফিরিয়ে এনে পূজো করা উচিত। কিন্তু খুঁজে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অবশেষে 'দৈনিক বসুমতীতে' রসিকচন্দ্র একটি বিজ্ঞাপন পাঠালেন। বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়ে বেরুলো। সেটি এই :

"একটি শাদা গরুর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। গরুটির গায়ে আল্‌কাৎরায় লেখা, 'রসিক চৌধুরীকে ভোট দিন্।' যদি কেহ খোঁজ পান তবে দয়া করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন অফিসে সংবাদ দিলে যথাসাধ্য পুরস্কৃত হইবেন।"

নীলু

ছেলের আবদারের আর বিরাম নেই। মা, ঠাকুমা, কাকিমা, পিসি সবাই তটস্থ। বয়স আট বছর, একটিমাত্র ছেলে, পরিবারের মধ্যে তার আদর সকলের চেয়ে—চৌধুরী বংশের সে কুলতিলক। নাম তার নীলু।

নীলুর মাথায় মেয়েদের মতন চুল, বাবা তারকনাথের মানৎ। তার নাকের ডানদিকে সোনার আঙট, ডান পায়ে লোহার কড়া। আট বছর বয়স পর্যন্ত নানা রোগে সে কাতর। তার পরমায়ুর জন্য ৺কালীঘাটে অনেকগুলি ছাগলকে খুন করা হয়েছে, অনেক টাকা গেছে তীর্থের পাণ্ডাদের থলিতে। ডাক্তার ওষুধ, বার-ব্রত শান্তি স্বস্ত্যয়ন, কলহ বিবাদ। এমনি করেই নীলুর বয়স হোল আট বছর।

দুরন্ত ছেলে সে নয় কিন্তু জেদী। সেদিন বললে, তার দিকে চেয়ে ও-পাড়ার সন্তু হেসে গেছে, তাকে কেউ মেরে আসুক।

ভীষণ বিপদ, পরের ছেলেকে মারবে কে? কেউ রাজি হয় না দেখে নীলু হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করতে লাগল। বাড়ীসুদ্ধ সবাই শশব্যস্ত। ঠাকুমা বলেন, আহা, দিয়েই এসো না গা দু ঘা সন্তুকে? ছেলেটা যায় যে! চুপ করো ভাই নীলু, চুপ করো, লক্ষ্মী বাবা আমার। এখুনি গিয়ে সন্তুর মাথা ফাটিয়ে দিয়ে আসছে, ছ্যাখো না।

নীলু চীৎকার করে বললে, আমার সামনে এনে তাকে—

শেষকালে একজন গিয়ে ওপাড়ার সন্তুকে ভুলিয়ে এ বাড়ীতে ধরে নিয়ে এলো।

বাড়ীর হিন্দুস্থানী ঝি ছিল, তার ছেলের নাম মুণ্ডা। মুণ্ডার

ওপর হোলো হুকুম জারি, সে দিলে দু ঘা সন্তুকে। সন্তু চলে গেল কাঁদতে কাঁদতে। হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল নীলু।

মুণ্ডার মা'র নাম জানকি। জানকি তার ছেলেকে এ বাড়ীতে এনে ছেড়ে দিয়েছে মানুষ হবার জন্য। মুণ্ডা নীলুর সমবয়সী। এ বাড়ীতে তাকে কেউ খেতে দেয় না, বাড়ার লোকের পাত কুড়িয়ে খেয়ে সে মানুষ। মুখে তার সর্বদা হাসি, গায়ে ভীষণ জোর।

কিন্তু গায়েয় জোর থাকলেই বা কি! সর্বাঙ্গে তার কাল্‌শিরের দাগ, মাথায় কাটা-খোঁচা, হাতের দুটো আঙুল নখ-ওঠা, মুখে একটা দাঁত ভাঙা, বাঁ চোখের একটা তারায় ক্ষতচিহ্ন। ওইটুকু ছেলের

সর্বশরীরে এতগুলি আঘাত—এর পিছনে আছে বিপুল পরিমাণ অন্যায়ের ইতিহাস—সে-ইতিহাস নীলুরই সৃষ্টি।

ছেলে আবদার ধরে বসলো, বাপকে ঘোড়া হতে হবে, আর সেই ঘোড়ার পিঠে সে চড়বে। চেঁচিয়ে পাড়া মাতিয়ে তুললে। অগত্যা বাপকে হামাগুড়ি দিয়ে ঘোড়া সাজতে হোলো, নীলু উঠ্‌ল তাঁর পিঠে। সারাদিন বাপের আর নিষ্কৃতি নেই। বাপের শেষ বয়সের একটিমাত্র সন্তান, যা বলবে তাই শুনতে হবে।

শীতের রাত্রে নীলু ধরে বসলো, চৌবাচ্ছার জলে মুণ্ডাকে ডুবে থাকতে হবে। জেদ একবার ধরলে আর রক্ষা নাই। জান্‌কি তার ছেলের অসুখের ভয়ে কাঠ হয়ে রইল। কিন্তু আর দেরি করা চলল না। মুণ্ডা হাসিমুখে নামল চৌবাচ্ছার জলে। রইল সে অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না নীলু মায়ের কোলের ভিতরে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর মুণ্ডা কাঁপতে কাঁপতে উঠে এলো। জান্‌কি তার গা মুছিয়ে কাছে শুইয়ে রাতের বেলা চুপি চুপি কাঁদতে লাগল। তার স্বামী আজ বেঁচে থাকলে পরের বাড়াতে এমন দুঃখ সইতে হোতো না। মুণ্ডা তার অন্ধের নড়ি।

লেখপড়া শেখার দরকার নীলুর নেই। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে সে। কিছুই সে করবে না, সে কেবল বেঁচে থাকুক। বেঁচে থাকাটাই তার সকলের চেয়ে বড় কৃতীত্ব, মানুষ সে নাই বা হোলো!

মুণ্ডা তাকে ভালোবাসে। মার খেয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, তবু মুণ্ডা তার কাছ ছাড়া হয় না। মুণ্ডা এ বাড়ীতে খেতে পায়, থাকতে পায়, কেবল নীলুর কাছে অপমানের গৌরবলাভ করার জন্য। নীলুর মার সইবার একজন ছেলের দরকার। এ ছাড়া মুণ্ডার আর দাম নেই।

শ্রাবণের বর্ষা। অবিশ্রান্ত ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। পথে ঘাটে কোথাও লোক চলাচল নেই। নীলু আবদার ধরলে, মুণ্ডাকে একটা ব্যাঙ ধরে আনতে হবে।

এমন দুর্য্যোগে কোনো ছেলেই জলে নামে না—বিশেষ যার মা বাপ আছে। জানকি একটু আপত্তি করলে। ঠাকুমা বললে, নবাবের ব্যাটা, এই কাজটুকু আর করতে পারিসনে? সুখের গা, বিষ্টিতে ভিজলে ক্ষয়ে যাবে! যা, নিয়ে আয়গে একটা ব্যাঙ ধরে, হারামজাদা।

মুণ্ডা যাবার জন্যই উৎসুক। ঠাকুমার কথা শুনেই সে এক দৌড়ে পথে বেরিয়ে গেল। এমনি করেই এ বাড়ার নীলুকে খুশী করতে হয়। কাঁদলে তার অসুখ করবে, চেঁচালে তার কষ্ট হবে, আবদার ধরা জিনিষ না পেলে সে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় তুলবে; মাকে গাল্ দেবে, বাপকে লাথি মারবে, ঠাকুমাকে বঁটি নিয়ে কাটতে যাবে,—আরো যে কি করবে তা প্রকাশ করার নয়। এমনি করেই অত্যাচারের রথ চালিয়ে সে বড় হয়েছে, এমনি করেই দিন গেছে, বছর গেছে, এমনি করেই চিরদিন চল্‌বে।

মুণ্ডা যখন ফিরে এলো তখন সন্ধ্যা। আকাশ মেঘে আর বৃষ্টিতে অন্ধকার। উঠানে এসে সে যখন দাঁড়ালো তখন তার সর্বাঙ্গ দিয়ে জল পড়ছে। তার বলিষ্ঠ কষ্টসহিষ্ণু শরীর, মুখে বিজয়গর্বের হাসি। কাপড়ের কোঁচড়ে সে ব্যাঙটিকে বেঁধে এনেছে। কোথা থেকে ধরে আনল সে কথা আর কেউ শুনতে চায় না। এখান থেকে এক মাইল দূরে আছে চাটুয্যেদের কলাবাগান, সেই বাগানের সংলগ্ন পুকুর। পাঁচিল ডিঙিয়ে সে জলের ধারে গিয়ে বসেছিল, এমন সময় পিছন থেকে উড়ে মালা এসে ধরলো তার গলা টিপে, পিঠে কিল্ বসিয়ে দিলে দু' চারটে। বললে, সড়া, চুর!

মুণ্ডা তাকে মিনতি করে জানালে, আমি চোর নই। আমি চাই একটা ব্যাঙ, বাবুর ছেলের জন্যে।—এই বলে সে তার মায়ের দেওয়া জল খাবারের পয়সাটা ট্যাঁক্ থেকে বার করে দিলে ঘুষ উড়ে মালীর হাতে। মালী খুশী হয়ে চলে গেল।—মুণ্ডার এই ইতিহাস শোনবার মানুষ এ সংসারে কেউ নেই। তাই মুখে তার কেবলমাত্র হাসি।

মা বললে, কী শক্ত প্রাণ, ছোটলোকের ছেলে কি না-

বাবা বললেন, মেড়োর জাত, ওরা ছাতু খায়।

ব্যাঙের পায়ে দড়ি বেঁধে রাখা হোলো। এক সময়ে নীলু সেটাকে লাঠির ঘায়ে মেরে ফেললে।

*   *   *   *

সেই নীলু এখন বেশ বড় হয়েছে। লেখাপড়া তার হয়নি। শিখেছে কয়েকটা ইংরেজি কথা, সেইগুলো সে যেখানে সেখানে চালিয়ে দেয়। বড় হয়েছে, কিন্তু মানুষ হয়নি। চেহারাটা রোগা, দুর্বল, রক্তহীন। পৃথিবীর কিছুতেই তার উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই

মাসের মধ্যে অন্ততঃ এক সপ্তাহ সে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। সুস্থ শরীর কেমন তা সে জীবনে জানে না।

কার দোষে তার এমন হোলো কে জানে! হয় ত কারও দোষ নেই, এই তার নিয়তি। মা বাপ প্রভৃতির সম্বন্ধে সে বিরক্ত, তারা যেন শত্রু। বন্ধুবান্ধব তার নেই, সে একা। আজন্ম স্বার্থপর সে, বন্ধুবান্ধব পাবে কোথায়?

অনেককাল পরে একদিন সেই মুণ্ডার সঙ্গে তার দেখা। মুণ্ডা আর তার মা বহুদিন হোলো চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

নীলু জিজ্ঞাসা করলে, চিনতে পারিস মুণ্ডা?

পার্‌তা হ্যায়।—বলে মুণ্ডা তার পায়ের ধূলো নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়ালো।

কোথায় আছিস আজকাল? কি করিস?

মুণ্ডা জানালো সে এখন হাঁসপাতালে চাকরি করে। কিন্তু তার বলবান দেহটার দিকে নীলু বার বার তাকাতে লাগল। সুস্থ বলিষ্ঠ কর্মঠ দেহ,—ব্যায়ামের দ্বারা সে দেহ দৃঢ়গঠিত। তৃষ্ণার্ত ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে নীলু তার দিকে তাকাতে লাগল।

এক সময় মুণ্ডার পিঠ চাপড়ে বললে, বড়লোকের ছেলে না হয়ে ভালোই হয়েছে, এই বেশ। ভালো স্বাস্থ্য যদি না থাকে তাহলে—

এই বলে নীলু একবার পথের দিকে তাকালো, তার পর নিশ্বাস ফেলে বললে, আচ্ছা যাই ভাই, আবার দেখা হবে, কেমন?

মুণ্ডা ঘাড় নাড়লো। নীলু মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

চন্দর

ঠাকুর মশাইয়ের সংসারে আপনার লোক বলতে আর কেউ নেই। সেবার গ্রামে কি একটা মহামারী দেখা দিল, দেখতে দেখতে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা একে একে ইহলীলা সংবরণ করলে। দুর্ভাগ্য আসে দরিদ্রেরই সংসারে, সুতরাং দুঃখ করবার আর কিছু নেই। আত্মীয় পরিজন সবাইত গেলই উপরন্তু দেনার দায়ে ঠাকুর মশাইকে বাস্তুভিটাটি পর্যন্ত মহাজনের হাতে ছেড়ে দিতে হোলো। এবার তিনি পথে বসলেন।

রইল কেবল একজন, সে বাড়ীর পুরানো চাকর। নাম চন্দর। বহুকাল থেকে এই পরিবারে সে মানুষ। লোকটা অত্যন্ত বিনয়ী এবং নিরীহ। তাকে দেখলে মনে হতে পারে জীবনে কোনোদিন সে রাগ করেনি। তার ঠিক বয়সটা অনুমান করা কঠিন, কেউ বলে তিরিশ কেউ বলে পঞ্চাশ। কিন্তু বয়স তার যাই হোক, সে যথেষ্ট পরিশ্রমী এবং শান্ত। সাত চড়ে রা নেই।

ঠাকুর মশাই বললেন, তোরই মরবার কথা চন্দর, কিন্তু তুই রইলি বেঁচে। আমি এখন তোকে খাওয়াই পরাই কি উপায়ে বল্‌ত ?

সবিনয়ে হেসে হাত দুখানা কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে চন্দর বললে, এজ্ঞে, আমি আপনার পায়ের জুতো, কর্তা। আমাকে মারবেন মারুন, কাটবেন কাটুন, আমি আপনাকে ছেড়ে যেতে পারবো না।

ঠাকুর মশাই বললেন, এখন তবে কি নিয়ে থাকবি, আমি ত আর তোকে আগেকার মতো মাইনে-পত্র দিতে পারবো না ?

চন্দর বললে, আপনার কত খেয়েছি কত নিয়েছি, মাইনে যদি আর না-ই দেন্ তাহলেই কি আর চলে যেতে পারবো ?

একেবারে প্রভুভক্ত জীব। ঠাকুর মশাইয়ের ব্যবহারের জন্য জল তুলে আনে, পূজোর ফুল তুলে দেয়, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে প্রভুর পদসেবা করে।

একদিন ঠাকুর মশাই বললেন, হ্যারে চন্দর, আগে তোর যে বদ্ অভ্যোসটা ছিল আজকাল সেটা সেরে গেছে ত?

চন্দর বললে, এজ্ঞে সে কি কথা, চুরি ত আর আমি করিনে? আপনার ঘরে চুরি করলে আমার যে সাতজন্ম নরকবাস হবে ঠাকুর!

ঠাকুর মশাই হেসে বললেন,. তোর চুরি বরং সহ্য হবে চন্দর, কিন্তু তুই ধর্মের কথা বলিসনে বাবা।

চন্দর হাত কচ্‌লে বললে, হেঁ হেঁ!

গ্রামে বারোয়ারি তলায় একটি শিবের মন্দির ছিল. ঠাকুর মশাই তার পূজারি! পুরাণো মন্দিরটির পাশের ঘরটিতে তিনি থাকেন, ঘরের আসবাব তাঁর যৎসামান্য—ঘরের বাইরের জায়গাটুকুতে থাকে চন্দর। ঠাকুর মশাইয়ের মতো সংসারে তারো কেউ নেই। ঠাকুর মশাই রাঁধেন, আর সে তাঁর প্রসাদ পায়।

গ্রামের সেই মহামারাতে অনেক লোক গ্রাম ছেড়ে নানা দেশে পালিয়েছে, মন্দিরে আর বিশেষ কেউ পূজো দিতে আসে না। নিজেরাই খেতে পায় না, শিব ঠাকুরকে আর খাওয়াবে কেমন করে? মন্দিরের অবস্থা দিনে দিনে অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠলো। ঠাকুর মশাইয়ের দিন চলা ভার। নগদ পয়সাকড়ি ত দূরের কথা, খাবার জিনিসপত্রও আসা বন্ধ হলো।

ঠাকুর মশাই একদিন অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। বললেন, তুই অপয়া হতভাগা, তোর জন্যেই আমার এত দুঃখ, তুই দূর হয়ে যা। আমিও চলে যাচ্ছি যে দিকে দু চোখ যায়।

চন্দর বললে, কোথা যাবো কর্তা?

সে আমি কি জানি। আমার সবাই যে চুলোয় গেছে, তুইও যা সেইখানে।

চন্দর বললে, আফিংয়ের পয়সা দিন কর্তা, আমি বিষ খেয়ে মরবো!

ঠাকুর মশাই রাগে একখানা চ্যালা কাঠ নিয়ে তাকে তাড়া করলেন। বললেন, বেরো হতভাগা!

অতঃপর তিনি এই দুঃখের দেশ ত্যাগ করে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আর তিনি কোনোদিন এ গ্রামে ফিরবেন না। ঘরের জিনিসপত্র অতি সামান্য, সঙ্গে কিছু নেবার নেই। ঘটি বাটি সব দেনার দায়ে আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। ছোট একটি বাক্সে সামান্য ক'খানা কাপড় চাদর ছিল। বাক্সের তালা-চাবি খুলে তিনি দেখলেন, একখানা পুঁথি পড়ে আছে কিন্তু কাপড় চাদরের চিহ্ন মাত্র নেই। কি হোলো? আবার তিনি বাইরে এসে চন্দরকে ডাকলেন। চন্দর কোথাও যায়নি, ডাক শুনে কাছে এসে দাঁড়ালো। তিনি বললেন, হতভাগা, তালা চাবি বন্ধ, ভেতর থেকে কাপড় চোপড় গেল কোথায়?

চন্দর বললে, তলায় হয়ত ফুটো ছিল, কর্তা।

তাইত, এ কথাটা কিন্তু ঠাকুর মশাইয়ের আগে মনে হয়নি, তিনি আবার ঘরে ঢুকে বাক্স পরীক্ষা করে দেখলেন, সত্যিই বটে, ছোট্ট একটা ছিদ্র রয়েছে! ওই ছিদ্র দিয়েই সব বেরিয়ে গেছে।

যাক্ গে, তিনি আবার প্রস্তুত হতে লাগলেন। একটা মাটির হাঁড়িতে অনেকদিন আগেকার গোটাকয়েক পয়সা জমা ছিল,—শিবের নামের পয়সা,—হাঁড়িটা নাড়াচাড়া করে দেখা গেল, পয়সাগুলি নেই। আবার তিনি চীৎকার করে চন্দরকে ডাকলেন। বললেন, হারামজাদা, চোর, আমি হলপ করে বলতে পারি, এ তোর কাজ!

চন্দর জিব কেটে চোখ কপালে তুলে বললে, এজ্ঞে সে কি কথা, কোথায় রেখেছিলেন পয়সা, কর্তা?

ঠাকুর রাগে হাঁড়টা তার দিকে গড়িয়ে দিলেন। চন্দর বললে, এই হাঁড়িতে? তবে ত হারাবেই কর্তা! এত ইঁদুর বেড়ালের উৎপাত, পয়সা থাকবে কেমন করে?

তা বটে, এ কথাটা কিন্তু ঠাকুর মশাইয়ের আগে মনে হয়নি। তাঁর রাগ পড়ে গেল, নিরস্ত হয়ে আবার তিনি বিদেশ যাত্রার জন্য আয়োজন করতে লাগলেন।

গ্রামের পরে মাঠ, মাঠের পথ দিয়ে কিছুদূর গেলে নদী। সেই নদী পার হয়ে গেলে ঠাকুর মশাইয়ের পৈতৃক যজমানদের গ্রাম পড়ে। তিনি স্থির করলেন, যজমানদের কাছে তিনি কিছু কিছু অর্থসাহায্য নিয়ে তীর্থযাত্রা করবেন। জ্যোতিষ বিদ্যা তাঁর অল্প অল্প জানা ছিল, তাই দিয়ে তিনি দিন যাপন করবেন। সংসারে একজন মানুষের আর ভাবনা কি?

একটি ঝুলি কাঁধে নিয়ে একাকী সেদিন দুপুর রোদে তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন। মাঠের পথ ধরে কিছুদূর গিয়ে তিনি পিছন ফিরে দেখেন, চন্দর।

আবার যে তুই ভূতের মতন পিছু নিয়েছিস?

হাত কচলে চন্দর বললে, এজ্ঞে!

আমাকে তুই ছাড়বিনে হতভাগা?

এজ্ঞে, আপনিই কি আমাকে ছাড়তে পারেন? আমি আপনার পায়ের জুতো যে!

আর কোনো উপায় নেই, অগত্যা ঠাকুর মশাই চন্দরকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হলেন।

নদী পার হয়ে যজমানদের গ্রাম। কিন্তু তারাও দরিদ্র। ঠাকুর মশাই একে একে কয়েকদিন তাদের বাড়ী অতিথি হলেন কিন্তু নগদ বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। লোকে এক মুঠো খেতে দিতে পারে কিন্তু পয়সা কাড় তাদের কাছে পাওয়া বড়ই কঠিন। ঠাকুর মশাইয়ের ঝুলিতে কয়েকটি মাত্র পয়সা জমা হোলো। একদিন ঝুলিতে সে পয়সা গুলিও খুঁজে পাওয়া গেল না। ঠাকুর মশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। চন্দর তাঁকে পাখার বাতাস করে বললে, কি হোলো কর্তা?

ঠাকুর মশাই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, কোথায় গেল পয়সা ক'টা?

চন্দর চুপি চুপি তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বললে, আমি জানি কর্তা, বলতে সাহস হয় না কিন্তু আমি জানি কে নিয়েছে!

ঠাকুর মশাই দাঁতের ওপর দাঁত চেপে বললেন, শিগগির বল্ নৈলে তোকে এখুনি ব্রহ্মশাপ দেবো।

হাত জোড় করে চন্দর বললে, রাগ করবেন না কর্তা, এরা সবাই দুঃখী গরীব······আহা! কে নিয়েছে জানেন, ওই আপনার যজমান, ওই লম্বা লোকটা—

সে কি, ওই ত দিয়েছিল পয়সা!

সেই কথাই ত বলছি কর্তা, এমনই দিনকাল পড়েছে। গরীবলোক কিনা, দিনের বেলা প্রণামী দিয়ে রাতের বেলা হাত সাফাই করে নেয়!

তা বটে, এই সামান্য কথাটা ঠাকুর মশাইয়ের এতক্ষণ মনেই হয়নি। সত্যিই ত, দিনকাল ভারি খারাপ,—বেচারা যজমানদের

জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। আর কিন্তু এখানে থাকা ভালো দেখায় না। বললেন, কিছু মনে করিসনে বাবা চন্দর, তোকে অনেক কটু কথা বলেছি। চল্ আজই আমরা এখান থেকে চলে যাই।

পরদিন প্রভাতে উঠে চাকর এবং মনিব আবার দেশত্যাগ করে গেলেন। বন পার হতে হোলো, পার হতে হোলো প্রান্তর, ছোট ছোট নদী ও খাল, তারপর গ্রাম, গ্রাম পার হয়ে দুজনকে আসতে হোলো ইস্‌লামপুর রেল ষ্টেশন।

গাড়ী ভাড়া নেই সুতরাং ষ্টেশনের ধারে ঝুলি এলিয়ে ঠাকুর মশাই জ্যোতির্বিদ্যার পুঁথি খুলে পথে বসে গেলেন। একটু দূরে চন্দর হাত জোড় করে বসে গেল ভক্ত হনুমানের মতো।

হ্যাঁ, বেশ কিছু রোজগার হোলো বটে। ঠাকুর মশাই অনেক পথিকের হাত দেখে দেখে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে দিলেন। অনেকে খুশি হয়ে পয়সা দিয়ে গেল। চন্দর হাত জোড় করে চক্ষু বুজে ভক্তি গদগদচিত্তে বসে রইল, পয়সার শব্দ হোলেই কেবল সে এক একবার মিট মিট করে তাকাচ্ছিল।

দিন তিনেক কাটলো সেই ষ্টেশনের ধারে। কিছু পয়সা জমিয়ে ঠাকুর মশাই তাঁর অনুগত ভৃত্যটিকে নিয়ে সেদিন সকাল বেলায় শহরগামী একখানা ট্রেণে চড়ে বসলেন। বললেন, নিজের কপাল যেমনই হোক, পরের কপাল নিয়ে মাথা ঘামালে কপাল কিছু ফিরে যায়, বুঝলি বাবা?

চন্দর হাত কচ্‌লে বললে, তাইত, এজ্ঞে!

ঠাকুর মশাই চলন্ত ট্রেণের ভিতরে বসে খুসি মনে অনেক কথা বলে গেলেন। তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করবার পূর্বে পয়সার থলিটা বার করে বললেন, চন্দর, তুই আমার বড় বিশ্বাসী বাবা, এই নে, রাখ্, পয়সা কড়ি এবার থেকে তোরই কাছে থাকবে। ওসব আমি সামলাতে পারিনে।—পয়সার থলিটা তিনি চন্দরের হাতে গুঁজে দিলেন।

আজ চন্দর স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে অনুগত ভৃত্য, সে সেবক,

কিন্তু বিশ্বাসী সে নয়। জীবনে কোনোদিন পয়সার থলি হাতে দিয়ে কেউ তাকে বিশ্বাস করেনি। ঠাকুর মশাইয়ের ঘরে যত চুরি আজ পর্যন্ত হয়েছে, সবই তার কাজ। সে মিথ্যাবাদী, সে চোর, সে অবিশ্বাসী,—নিজের অসৎ স্বভাবের জন্য কোনোদিন সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু জীবনে আজ এই প্রথম অনুতাপে তার চোখে জল এসে দাঁড়ালো। এই বিশ্বাসের ভার সে বইবে কেমন করে? কেমন করে বইবে সে স্নেহের এই সর্বোৎকৃষ্ট দান?

কিন্তু তার মুখে আর একটি কথাও ফুটলো না। কেবল নিঃশব্দে ঠাকুর মশাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সে নীরবে জানলার বাইরে প্রশান্ত প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইলো।

শুকনো পাতার দৌড়

কিশোর উপন্যাস

শুকনো পাতার দৌড়

ভোলানাথের একটি মাত্র দোষ—সে ভাল মানুষ। মানে মিছামিছি অত্যাচার সয়ে সে চুপ করে থাকতে জানে। তুচ্ছ কারণে কতবার সে কঠিন শাস্তি ভোগ করেছে। তা ছাড়া অকারণে অপমান সহ্য করা ত তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

সৎ-মায়ের সে দু'চোখের বিষ। আগে মারধোর করতো; এখন হয়রাণ হয়ে শুধু গালাগালি করে।

—মর্‌না, কত লোকের ছেলে মরে আর তুই···যা, চোখ দুটোর মাথা ত এখনও খাসনি, যেখানে খুসী চলে যা।

বহুদিন থেকে এমনি গালাগালি শুনে ভোলানাথের কান দুটো ক্লান্ত হয়ে গেছে।

সেদিন সৎ-মা বল্‌ল—রোজগার করে আনো গে নৈলে আজ থেকে এ বাড়ীতে আর খেতে পাবে না। যাও।

এমন নতুন নয়। এ রকম উপবাস ভোলানাথকে অনেকবার করতে হয়েছে।

তখন বর্ষাকাল আরম্ভ। চাষ আবাদের সময়। গ্রামের কাছেই নদী—সেখানে মহাজনদের নৌকো আসে। সকাল থেকে সারা আকাশে কালো কালো মেঘ জমে উঠেছে। নদীর জল ছল্‌ ছল্‌ করছে।

চুপি চুপি ভোলানাথ বেরিয়ে এল। বরাবর নদীর ধারে এসে একজন মাঝিকে বল্‌ল—আমায় শহরে নিয়ে যাবে?

মাঝি বল্‌ল—ভাড়া দেবে কত?

কিছুই নেই আমার কাছে—এম্‌নি বলছি।

বিনামূল্যে পৃথিবীর কাছ থেকে যে একটুখানি উপকার আশা করে, এত বড় যে বোকা—তাকে আর কি বলা যেতে পারে! ভোলানাথের অসহায় দুটি চোখের দিকে চেয়ে মাঝি বল্‌ল—তামুক সাজতে জানো?

জানি। গুরুমশায়ের তামাক আমিই সাজ্‌তাম।

এসো তবে।

ভোলানাথ নৌকোয় গিয়ে উঠলো। গ্রামের ঘাট ছেড়ে বহুদূরে দক্ষিণে যখন নৌকা চল্‌ল ভোলানাথ উদাস দৃষ্টিতে পিছন দিকে চেয়ে রইল। শস্যশ্যামলা এত বড় পল্লীগ্রামখানিতে শুধু তারই অন্ন জুট্‌লো না।

কলিকাতা শহর বেশী দূরে নয়। শহর দেখে ভোলানাথ একেবারে অবাক! এত লোকজন এত গাড়ী ঘোড়া এত দোকান বাজার!

সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মাথার মধ্যে ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছে। দুদিন পেটে কিছু পড়েনি।—সেদিন রাতে সে একটা বাগানের ধারে শুয়ে রইলো।

পরদিন সকালে আবার পথ চলা সুরু হলো। অনেক দূরে এসে একটা গলির মুখে সে চুপ করে দাঁড়ালো। মাথার ওপর রোদ উঠেছে—খেয়াল নেই!

সুমুখের বড় বাড়ীটায় সেদিন বিয়ে। সানাই বাজ্‌ছে। দুপুর বেলা মেয়েরা জল সইতে বেরিয়েছে। ফেরবার মুখে পথের ধারে ভোলানাথকে তাদের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে একজন বল্‌লে তোমার বাড়ী কোথায় ভাই?

ভোলানাথ বল্‌ল—বাড়ী? সে কল্‌কাতা ছাড়িয়ে অনেক দূরে।

কাদের ছেলে তুমি?

বামুনদের। কিছু খেতে দেবেন আমাকে?

একজন তার হাত ধরে বল্‌ল—নিশ্চয় দেবো। এসো আমাদের বাড়ী।

বিয়েবাড়ীতে গিয়ে ভোলানাথ উঠলো। চারদিকে গোলমাল। তবু বেশ ভালই লাগলো। এত ঘটার বিয়ে সে আর কবে দেখেছে! ছেলেদের সঙ্গে মিলে-মিশে সেদিনটা বেশ কাট্‌লো।

একটা চাকর ত রীতিমত ভোলানাথের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুললো। লোকটা সত্যিই ভালো—বেশ মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলতে জানে। বল্‌ল—আমারও মা বাপ নেই। পেট চলে না তাই পরের বাড়ী চাকরি করি। তা এরা আমায় ভারি ভালবাসে!

ভোলানাথ চুপ করে রইলো। চাকরটা আবার বল্‌ল—যখন তখন আমায় বক্‌শিস্ দেয়। এই দেখো না—খুসী হয়ে এবার এক ছড়া সোনার হারই দিয়ে দিল। ট্যাঁক থেকে সে হার ছড়া বার করলো।

ভোলানাথ বল্‌ল—বা রে, চমৎকার ত!

সে বল্‌ল—তুমি থাকলে তোমাকেও দেবে। আর দেখো! ভয় হচ্ছে পাছে কাজকর্ম করতে গিয়ে এটা হারিয়ে যায়। রাখবে এটা তোমার কাছে? সময় মত আবার ফিরিয়ে নেবো—কি বল?

তা যদি রাখতে দাও তা হলে—

হাসতে হাসতে চাকরটা হারছড়া ভোলানাথের কাছে রেখে চলে গেল।

সকাল বেলা বর বিদায়ের পালা। কিন্তু এর মধ্যে একটা গোলমাল উঠেছে।

কনের গায়ের গয়না চুরি গেছে। চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব। ঝি চাকর বামুন—সব একেবারে থরহরি কম্প! বাড়ীর কর্তা ও গৃহিণী একেবারে রাগে আগুন। বললেন—যে নিয়েছে তাকে ধরতে পারলে জেলে দেবো।

নতুন লোক ভোলানাথ। সকলে এসে তাকে চেপে ধরতেই সোনার হার বেরিয়ে পড়লো। আর যায় কোথা! ভালোমানুষ বলে' ত আর ক্ষমা করা যায় না! চড় চাপড় কিল ঘুসির সঙ্গে বেদম প্রহার সুরু হয়ে গেল। ভোলানাথ কি একটা কথা বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু তখন শোনে কে!

সকলে বল্‌লে—পুলিশে দেওয়া হোক।

লোকের ভিড় সরিয়ে দিয়ে তখন একজন লোক বেরিয়ে এল। সেই মেয়েটি! অসহায় বলে যে ভোলানাথকে কাল পথ থেকে হাত ধরে এনেছিল।

বল্‌ল—ছেড়ে দাও ওকে।

বাড়ীর বড় মেয়ে সুতরাং কেউ তার কথা অমান্য করতে পারে না! সকলে সরে দাঁড়ালো। মেয়েটি পথের দিকে হাত বাড়িয়ে ভোলানাথকে বল্‌ল—যাও, তুমি যে চোর হতে পারো এ আমি জানতাম না!

ব্যথায় ভোলানাথের ভেতরটা টন্‌ টন্‌ করে উঠলো। কিন্তু কিছুই সে বলতে পারলো না, চোর বদ্‌নাম নিয়েই আবার পথে নেমে চলে গেল।

চারিদিকে তখন ঝম্‌ ঝম্‌ করে বৃষ্টি নেমে এসেছে।

* * * *

এক একটি দিন যে কেমন করে কাটে তা শুধু ভোলানাথই জানে। উপবাস করে করেও সে ক্লান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু উপায় কি!

শহরের একধারে একটা বাগানের কাছে এসে সে চুপ করে বসেছিল। তখনও সন্ধ্যার একটু বিলম্ব আছে।

সারাদিনের বেচাকেনার পর এই পথে জেলেরা ঘরে ফেরে। সেদিনও তারা গান গাইতে গাইতে ফিরছিল। ভোলানাথের কাছে এসে একজন বল্‌ল—এখানে বসে কেন ঠাকুর? ঘর কোথা তোমার?

ভোলানাথ বল্‌ল—ঘর? সে এদিকে নয়।

কি কাজ কর?

করি না কিছু।

লোকটা একটুখানি ভেবে নিয়ে বল্‌ল—যাবে আমাদের সঙ্গে? আমাদের মাছের কারবারে দিব্যি থাকবে সেখানে। কাজ যদি কিছু কর ত দেবো। যাবে?

ভোলানাথ উঠে দাঁড়ালো। বল্‌লে—যাবো।

বামুনের ছেলে দেখে তারা সবাই পায়ের ধূলো নিল। শুধু তাই নয়, একটি ভদ্রলোকের ছেলেকে তারা যে আজ নিজেদের মধ্যে পেয়েছে এজন্য সমস্ত পথখানি ধরে তারা আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো।

সমস্ত রাস্তা পায়ে হেঁটে তারা বরাবর খালের ধারে এল। দু'তিনখানা পান্‌সি-নৌকো ঘাটে বাঁধা ছিল, সকলে মিলে তার ওপর উঠলো। নৌকো ছেড়ে দিল। যা হোক একটা আশ্রয় পাবার আনন্দে ভোলানাথের চোখে তখন জল এসেছে।

নতুন খাল দিয়ে এঁকে বেঁকে পান্‌সি চল্‌তে লাগ্‌লো। বর্ষার জল জমে দুধারের মাঠ তখন চাঁদের আলোয় চক্‌ চক্‌ করছে। মাথা উঁচু করলে দেখা যায়, দূরের ছোট ছোট গ্রামে টিম্‌ টিম্‌ করে আলো জ্বলছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর ব্যাঙের ডাক ছাড়া চারদিক এরই মধ্যে একেবারে নিশুতি। জেলেরা কেবল মাঝে মাঝে একটা গান ধরছিল।

প্রায় তিন ক্রোশ রাস্তা। ঘণ্টা দুই লাগে। গ্রামের ঘাটে এসে যখন সকলে নাম্‌লো তখন একটু রাত হয়েছে।

ভোলানাথকে সঙ্গে করে নিয়ে আলো ধরে একজন এগিয়ে গেল। ভদ্রলোকের ছেলে এখানে থাকতে এসেছে দেখে সকলে ত অবাক!

ছোট্ট গ্রামখানি আর এক টুকরো ধানের ক্ষেত; এ ছাড়া

আর সবই খাল বিল, বড় বড় জলকর, লোনা দিঘী,—আর কিছু না। দূরে কোথাও কোথাও বা তাল আর নারিকেল বন। আরও দূরে কোন কোন গ্রামের গাছের সারি দেখা যায়।

চারদিক সত্যিই নিস্তব্ধ। প্রকাণ্ড সেই জলরাশির কাছে এসে দাঁড়ালে মনে হয়, পৃথিবীতে আর কোথাও মানুষ নেই। আদিকালে যেন আবার ফিরে এসেছি, এখনও মানুষ পশু পাখী কিছুই সৃষ্টি হয় নি।

যে দিকেই তাকাও শুধু জল। এই জলের ধারেই ভোলানাথের কয়েকটি দিন কেটে গেল। কাটলোও চমৎকার। এরা ছোট লোক হলে কি হবে, এমন ভদ্র ব্যবহার সব সময় পাওয়াই যায় না। ভোলানাথ একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল।

বেশ আরামে থাকে। সুখের সংসার। জেলে বলে গরীব নয় —বরং বড়লোক বলা যেতে পারে।

গায়ে পড়ে কেষ্ট পণ্ডিত এসে আলাপ করলো। লোকটা ভিন্ন গ্রামের লোক। যজমানি ব্রাহ্মণ। এখানে দু-এক ঘর শিষ্য আছে। তা ছাড়া বাড়ী বাড়ী পূজো করে দেয় বলে অনেকে তাকে একটুখানি শ্রদ্ধাও করে।

লোকটা রোজ রোজ এসে ভোলানাথকে নানা কথা শুনিয়ে যায়।

বলে—এই দিকেই এসেছিলাম; যাবার পথে ভাবলাম একবার দেখেই যাই। আহা, বেশ বেশ, চেহারা দেখলে চোখ জুড়ায়। বামুনের ছেলে দেখলেই চেনা যায়। তোমার বুঝি কেউ নেই বাবা?

ভোলানাথ বল্লে—উঁহু, না।

তা এখানে এলে কেন? কাকের বাসায় কোকিলের ছা!— তারপর এদিক ওদিক চেয়ে কেষ্ট পণ্ডিত আবার চুপি চুপি বলে— বামুনের ছেলে হয়ে ছোট জাতের ভাত কি খায় বাবা?

ভোলানাথ বল্লে—একটা যা হোক কাজ এখানে করবো।

ওই, তা হলেই হলো; একই কথা! ছোট জাতের নুন খাওয়া আর গুণ গাওয়া!

ভোলানাথ চুপ করে থাকে। লোকটা হড়্‌হড়্‌ করে নানারকম কথা বলে যায়। শেষ কালে কানের কাছে মুখ এনে এক সময় কেষ্ট পণ্ডিত বল্‌ল—বামুন ছাড়া বামুনের গতি নেই, বুঝলে বাবা? শাস্তরে বলে, এল্‌তলা বেল্‌তলা—ঘুরে ফিরে সেই ন্যাড়াতলা!

সেদিনকার মত লোকটা চলে গেল।

আবার তার পরদিন—

সেদিনও তেমনি নানা কথার পর হঠাৎ এক সময় বল্‌ল—আমার সংসারে কোনো কষ্টই নেই; চাল, ডাল, পুকুরে মাছ, তরি-তরকারী,—রাজার হালে থাকা চলে! আমার মেয়ের মতন যত্ন-আত্তি করবে, তেমন মেয়ে গাঁয়ে আর আছে, কেউ বলুন দেখি?

ভোলানাথ আগের মতই চুপ করে রইল।

কেষ্ট পণ্ডিত আবার বল্‌ল—হতেই হবে, মেয়েত নয়, লক্ষ্মী; গিয়ে না দেখলে কি আর কেউ বিশ্বাস করবে?—যাবে আমার সঙ্গে বাবা? এই ত মাত্তর দু কোশ রাস্তা!

ভোলানাথ বল্‌ল—এদের না বলে যদি যাই তা হলে এরা কি মনে করবে?

পণ্ডিত একবার তার মুখের দিকে চাইল, তারপর দেখতে দেখতে হঠাৎ হাউ হাউ করে ছেলে মানুষের মত কাঁদতে সুরু করে দিল।

বল্‌ল—আমার পোড়া কপাল তাই কেউ আমায় বিশ্বাস করে না।

ভোলানাথ রাজি না হয়ে আর যায় কোথায়!

সে দিন অপরাহ্নের আগেই ভোলানাথকে সঙ্গে করে কেষ্ট পণ্ডিত চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লো। সোজা রাস্তায় গেলে পাছে

কেউ দেখতে পায় এজন্যে ক্ষেতের আল ধরে চলতে লাগলো। উঁচু উঁচু ধানের শিষের আড়ালে কারো নজরেই পড়লো না।

*   *   *   *

গ্রামের নাম রাজাহাট। কারো অবস্থাই ভালো নয়। ম্যালেরিয়ার ভয়ে লোকে সেখানে বাস করতে পারে না। কেষ্ট পণ্ডিত যতই বলুক তার অবস্থা এমন কিছু স্বচ্ছল নয়। লোকের বাড়ী পালা-পার্বণ করে তার দিন চলে।

দুজনে যখন পৌঁছল তখন রাত হয়েছে। মাটীর দাওয়ার ওপর আলো ধরে দাঁড়িয়ে একটি ফুট্‌ফুটে মেয়ে বল্‌ল—এত রাত হল যে বাবা?

হল ত হল, তাতে তোর কি? আলো রেখে এখন খাবার জোগাড় কর্‌।

মেয়েটির নাম টেঁপী। পিতার পিছনে ভোলানাথকে দেখে টেঁপী আর কিছু বল্‌ল না। আলোটা রেখে আস্তে আস্তে চলে গেল।

সে রাত্রে ভোলানাথকে জাগিয়ে রেখে পণ্ডিত অনর্গল কি সব বলে যেতে লাগলো। একেই ত তার কথা বেশীক্ষণ শুনতে ভাল লাগে না।

ভোলানাথকে সেদিন এক রকম জেগেই থাকতে হল।

পরদিন উঠতে একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল। মুখ হাত ধুয়ে মাঠে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে এসে ভোলানাথ দেখলো, বাড়ীতে কেমন যেন একটু তাড়াহুড়ো লেগে গেছে। পাড়ার দু একজন স্ত্রী পুরুষ আনাগোনা সুরু করে দিয়েছে। একজন ত স্পষ্টই বল্‌ল—যাক্‌ টেঁপীর তবু একটা উপায় হল।

ভোলানাথ কিছুই বুঝতে না পেরে অন্য দিকে চলে গেল। একটা ঘরের কাছে এসে দেখে সেখানে যজ্ঞি-বাড়ীর রান্না হচ্ছে। আর একটা ঘরে দেখে, সেখানে ফুল, বরণডালা, আলপনার সরঞ্জাম, নতুন বাসন-কোসন, রাঙ্গা চেলী ইত্যাদি থরে থরে সাজানো।

টেঁপী এতক্ষণ আড়ালেই ছিল, এবার বেরিয়ে আসতেই ভোলানাথ বল্‌ল—এ সব কি বলতে পারো ?

টেঁপীও যেন কি একটা কথা বলবার জন্য উৎসুক হয়েছিল। চুপি চুপি বল্‌ল—বল্‌বো ?

হাঁ।

তুমি পালাও এখান থেকে।

পালাবো ? কেন ?

টেঁপী বল্‌ল—আমার বাবাকে ত জানো না, আজ রাতে তিনি জোর করে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন।

ভোলানাথের মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। শুধু বল্‌ল—কোথায় পালাবো ? যেখানে ছিলাম সেখান থেকে না বলে চলে এসেছি, আর ত তারা ঠাঁই দেবে না ?

তা হোক, তুমি পালাও। এত বড় পৃথিবীতে কি তোমার জায়গা নেই ?

তা বটে। ভোলানাথ চুপ করে রইল।

টেঁপী বল্‌ল—মাঠ দিয়ে লুকিয়ে চলে যাও, কোশ খানেক গিয়ে একটা বড় আম বাগান পাবে, সেখান থেকে পূবদিক ধরে সোজা যুবরাজপুর চলে যাবে, সেইখানেই রেলগাড়ী পাবে। বুঝলে ? যাও আর দেরি করো না !

খিড়কির পুকুরের পথে ভোলানাথ বার হয়ে এল। পিছনে পিছনে এসে হঠাৎ এক সময় টেঁপী বল্‌ল—একটু দাঁড়াও।

চট্ করে সে একবার ভেতরে চলে গেল, আবার তখনই ঘুরে এসে খান চারেক বাতাসা ভোলানাথের হাতে গুজে দিয়ে বল্‌ল—খেয়ে নাও, জল কিন্তু দিতে পারবো না। উ-ই যে জোড়া তালগাছ দেখা যাচ্ছে, ওরই নীচে রাজকুমারীর সরোবর আছে, ওখানে জল খেয়ে চলে যেও।

বাতাসা খেয়ে ভোলানাথ অনেক দুর চলে গেল ; পিছন ফিরে একবার দেখলো টেঁপী তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তিতি প্রহর বেলা, মাথার উপর রোদ চন্ চন্ করছে। মাঠের ওপর গাছও নেই, ছায়াও নেই। কোথাও আশ্রয়ের চিহ্নও নেই। কেবল তেপান্তরের মাঠের মত চারদিক ধূ ধূ করছে।

কোথায় কত দূরে যেতে হবে সে কিছুই জানে না। মাথার ওপরে সূর্যের আগুনে আকাশটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। পায়ের তলায় শুকনো মাঠও গরম হয়ে উঠেছে। পা দুটোও ক্রমে যেন অবশ হয়ে আসছে।

বহুদূর পথ পার হয়ে সে যখন ইষ্টিশানের কাছে এল, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সে তখন অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে। কাছে একটি পয়সাও নেই যে, কিছু কিনে খাবে। এক ঘটি জলও কি কোথাও পাওয়া যায় না ?

একজন বল্‌ল—অতিথিশালায় যাবে বুঝি ?

অতিথিশালা ? কোন্ দিকে বল ত ?

ওই পথটা ধরে সোজা যেতে হবে। কিন্তু আর বোধ হয় সুবিধে হবে না। এতক্ষণে নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে !

ইষ্টিশান মাষ্টার এসে বললেন—কোথায় যাবে ছোকরা ?

ভোলানাথ চুপ করে রইল। কোথায় যাবে তা কি সে নিজেই জানে ! দেশে ফিরে গেলে ত আর কেউ ঠাঁই দেবে না ! সেই সৎ-মার অত্যাচার !

খানিকক্ষণ পরে মুখ তুলে সে বল্‌ল—একটা কোন কাজ আমায় দিতে পারেন ?

কাজ ? কি কাজ তুমি জানো ?—পরে ভোলানাথের মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে বাবুটি বললেন—তা একটা কাজ তোমায় দিতে পারি। বই খাতা ঝেড়ে ঝুড়ে গুছিয়ে রাখবে, তামাক সেজে দেবে, ফাই-ফরমাস খাটবে। কিন্তু পাঁচ টাকার বেশী মাইনে দিতে পারবো না, আর খাওয়া পরা পাবে।

তাই দেবেন।—বলে ভোলানাথ রাজি হয়ে গেল।

কাজ করে আর থাকে। কোনো কষ্ট নেই। রাতের বেলা বেশ একটি শোবার জায়গা মিলে গেছে। মাষ্টার বাবুর ভারি প্রিয়। তিনি সকল সময়ই খোঁজ-খবর রাখেন।

একটি ছেলে মাঝে মাঝে আসে। ভোলানাথের চেয়ে বয়সে কিছু বড় কিন্তু ছেলেটি বড় ভাল। ছেলেটির বিধবা মা আছে, একটি বোনও আছে, তার এখনও বিয়ে হয়নি।

কাজের ছুটি হয়ে গেলে দুটি ছেলেতে খানিকটা বেড়িয়ে আসে। অনেক দূরে একটা ছোট্ট পাহাড় আছে, তার কোল পর্যন্ত যায়, আবার সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে। এমনি করেই কয়েকটা দিন বেশ কেটে গেল।

নন্দলাল একদিন বল্‌ল—আজ আমাদের বাড়ীতে কিছু রান্না হয়নি।

কেন?

সে অনেক কথা ভাই। রান্না কেন হয়নি এ কথা কি আবার কেউ জিজ্ঞেস করে?

ভোলানাথ বল্‌ল—চল আমার কাছে পয়সা আছে ইষ্টিশানে খাবার কিনি গে!

কি হবে?

কেন, খাবো দুজনে?

আমি না হয় খেলাম কিন্তু বাড়ীতে মা-বোনের কি হবে?

তাঁদের জন্যেও কিনবে চল?

তাঁদের জন্যে!—নন্দলাল একটু থেমে বল্‌ল—তাঁদের না হয় তুমি একদিন খাওয়ালে কিন্তু রোজ কেমন করে জুটবে?

ভোলানাথ চুপ করে রইল। এ কথার পর সে আর কি বলতে পারে! কেউ আর কোনো কথা বল্‌ল না।

একটু আগে একখানা রেলগাড়ী পার হয়ে গেছে। দু একজন যাত্রী পুঁট্‌লি পোঁট্‌লা নিয়ে যাবার সুবিধা খুঁজছিল। দুই বন্ধুতে একখানা পাথরের ওপর এসে বসলো।

নন্দলাল বল্‌ল—একটি কথা তোমায় বলবো ভোলানাথ ?

মুখ তুলে চেয়ে ভোলানাথ বল্‌ল—বল না ?

নন্দলাল্ কথা কিছুই বল্‌ল না, মাথাটা তার আস্তে আস্তে হেঁট হয়ে গেল। এবং তখনই দেখতে দেখতে সে ভেতর থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। চোখের জল গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে টপ্ টপ্ করে পড়তে লাগলো। বল্‌ল—অনেকবার তোমায় বলবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি ভাই, লজ্জায় থেমে গেছি। তুমি যে কাজটা করছো ওটার আশায় আমি অনেক দিন থেকে বসে আছি। আমার মা-বোন উপবাস করে বসে থাকে, আমি তাদের খাওয়াতে পারিনি। মাষ্টার মশাইকে অনেকদিন থেকে বলতে তিনি একটু আশা দিয়েছিলেন ; কিন্তু তুমি আসবার পর থেকে—

নন্দলাল আর বলতে পারলো না। ভোলানাথও চুপ করে রইল।

আর একখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ী আসবার সময় হয়েছিল। উঠে যাবার সময় নন্দলাল বল্‌ল—আমায় ক্ষমা করো ভাই, খেতে না পেলে মানুষ আমার চেয়েও অনেক অন্যায় করে !

দুজনে উঠে অন্ধকারে দুদিকে চলে গেল।

পরদিন এক সময় মাষ্টার বাবু বললেন—কি হে ভোলানাথ, আজ তোমার হল কি ? কাজকর্মে তেমন মন বসছে না ; শরীর ভাল নেই বুঝি ?

ভোলানাথ বল্‌ল—কই না, বেশ ভালই আছি।

তবে ?

ভোলানাথ আস্তে আস্তে বল্‌ল—আপনাকে একটা কথা বলছিলাম। দেশ থেকে চিঠি এসেছে—মা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

ও, বুঝতে পারছি ! কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে ? তা বেশ ত,—যেও, আমার লোকের অভাব হবে না, নন্দলাল আছে। কবে যাবে ?

আজকেই যাবার কথা মা লিখেছেন।

আজকেই? তা হলে তোমার মাইনেটা চুকিয়ে নাও! এসো।

সামান্য কয়েকটি টাকা মাত্র পাওনা হয়েছিল। হাতে করে কয়েকটা টাকা আর ছোট একটি পুঁটলি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই নন্দলালের সাথে দেখা।

কোথায় চল্‌লে?

ভোলানাথ বল্‌লে—দেশে। মা ডেকেছেন!—আসি ভাই, অনেকদূর হেঁটে যেতে হবে, এর পরের ইষ্টিশানে গেলে তবে ট্রেণ পাবো।

এতদিন ধরে নন্দলাল তার সকল কথায় বিশ্বাস করে এসেছে। কিন্তু যে সৎ-মার দুর্ব্যবহার কথা সে এতদিন শুনেছে আজ তিনি ডেকে পাঠাবেন—এ কথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলো না।

বোকার মত নন্দলাল দাঁড়িয়ে রইল।

কিছু মনে করো না নন্দদা।—বলে ভোলানাথ তার মুখের দিকে একবার চেয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে চলতে লাগলো।

এ বেলায় এদিকে আর ট্রেণ আসবে না সুতরাং হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি! লাইনের পাশে পায়ে-চলা পথটি ধরে বহুদূর পর্যন্ত ভোলানাথকে পায়ে হেঁটেই যেতে হলো। দুধারে প্রকাণ্ড প্রান্তর, মাঝে মাঝে বহুদূরে কয়েকটি গাছের সারি নিয়ে এক একখানি অস্পষ্ট গ্রাম দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু কোথায় সে যাবে? সন্ধ্যার যেটুকু বিলম্ব আছে তাতে এই সময় টুকুর মধ্যে কতদূর অবধিই বা সে যেতে পারে! আশ্রয় তাকে কে দেবে? পৃথিবীর লোকে তাকে দয়া করবে এত বড় সৌভাগ্য সে ত করেনি!

বেলা পড়ে এল তবু চলার বিরাম নেই। মাঝে মাঝে বাঁধের জলের মধ্যে রাঙা মেঘের ছায়া সরে সরে যাচ্ছিল। ক্রমে দিনের

আলো মুছে এলো, পূবদিক অন্ধকার করে ঘনিয়ে এল ; দূরে আর কিছু দেখা যায় না। আকাশে তখন চাঁদ উঠলো। চাঁদের আলোয় অপরিচিত ম্যাঠের পথে হঁাটা বড় কঠিন।

চলতে চলতে ভোলানাথ দেখলো, পথটা গড়িয়ে একটা চওড়া রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। নিকটে বোধ হয় কোন গ্রাম আছে ভেবে সে সেই রাস্তা ধরে সোজা চলতে লাগলো। কিন্তু গ্রামের চিহ্ন মাত্রও নেই—কয়েকটা গাছের মধ্য দিয়ে পথটা পূবদিকে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

এবার কিন্তু শরীর ক্লান্ত হয়ে এসেছে, অনাহাবে সারাদিন থেকে আর কতখানি পরিশ্রমই বা করা চলে! একটা গাছের তলায় সে এসে চুপ করে বসলো! গাছের পাতা ঝরে পড়ে সে জায়গাটা বেশ পুরু হয়ে উঠেছিল ; ভোলানাথ সেখানে পুঁট্‌লিটি নামিয়ে শুয়ে পড়লো।

ফুর ফুর করে তখন সবে মাত্র ঠাণ্ডা হাওয়া হচ্ছে। সমস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন ধারে ধারে কোথায় মিলিয়ে গেল। ভোলানাথের চোখ ছুটিও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে এল!

সকাল হল। পাখীরা তাঁর আগেই প্রভাতী গান স্বরু করেছে। চাষারা লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে গরু তাড়াতে তাড়াতে মাঠের দিকে চলেছে। দূরে দুতিনখানা গ্রাম দেখা যাচ্ছে বটে।

পুঁট্‌লিটি নিয়ে ভোলানাথ উঠে দাঁড়ালো। কাকেও জিজ্ঞেস করে পথ ঘাট জানবার উপায় নেই। অথচ গত রাত থেকেই ক্ষুধা তৃষ্ণায় সে কাতর হয়ে আছে।

হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে কিছুদূর সে এগিয়ে চললো। সুমুখের পথে দূরে এতক্ষণ অনেকগুলি গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়েছিল, তাই এতক্ষণ পথ ঠাহর হয় নাই। ভোলানাথ এবার ভাল করে দেখলো গাছের সারির ভেতর দিয়ে একটি আঁকা বাঁকা পথ বরাবর কি একটা নদীর ধার পর্যন্ত চলে গেছে। নদীটি ছোট, স্রোত নেই,—বালি-মাটির

ভেতর দিয়ে ঝির ঝির করে বইছে কিনা তাও ঠিক বোঝা যায় না। এত সরু নদীটির মধ্যেও মাঝে মাঝে চর জেগে উঠেছে। দুধারেও প্রকাণ্ড চড়া বহুদুর পর্যন্ত গিয়ে একটা বাঁকের পাশে মিলিয়ে গেছে। এক সারি বক মাথার ওপর দিয়ে অনেক উঁচুতে উড়ে যাচ্ছিল—প্রভাতের লাল রোদ মাঝে মাঝে তদের পাখায় ঝিকমিক করে উঠছে।

নদীর তীরে এসে অনেকক্ষণ ভোলানাথ দাঁড়িয়ে রইল। মুখচোরা হাওয়া এক একবার এসে তার মুখে চোখে লাগায় ভারি আরাম বোধ হতে লাগল। অনেক দূর থেকে মৃদু মৃদু খোল করতালের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে; ক্রমে দেখা গেল একদল কীর্তনীয়া এই দিকে এগিয়ে আসছে।

কাছাকাছি এসে তাদের একজন বল্‌ল—এ দিকে নৌকো পাওয়া যায় কিনা—জানো ভাই?

ভোলানাথ বল্‌ল—জানি না ত, আমিও এখানে নতুন।

ও। কোন্ দিকে যাবে তুমি?

তার কিছু ঠিক নেই।

লোকগুলি আপাদ মস্তক তার দিকে তাকাতে লাগলো। একজন বলল-বেশ ছেলে ত? হাতে পুঁটলি রয়েছে অথচ কোথায় যাবে তার ঠিক নেই? পালিয়ে এসেছ বুঝি?

ভোলানাথ বল্‌ল—ঘরই নেই তা পালাবো কোত্থেকে? আপনারা কোথায় যাবেন?

আমাদের বরাত আছে, এক জায়গায় কের্তন গাইতে হবে। যাবে তুমি আমাদের সঙ্গে?

যাবো।

এসো তবে। তুমি বামুন?

হাঁ।

তারপর ঠিক হলো নৌকা এদিকে পাওয়া যাবে না, বাঁধের

ওদিক দিয়ে ঘুরে যেতে হবে। এখান থেকে প্রায় এক মাইল রাস্তা। বাঁধটা বেশ দেখা যাচ্ছে। ওপারে গিয়ে আবার ট্রেণ ধরতে হবে।

নদীর ধার দিয়ে সকলে চলতে লাগলো। চারদিকে তখন রোদ উঠেছে। এক মাইল রাস্তা হেঁটে আসতে অনেকটা দেরী লেগে গেল। বাঁধ পার হয়ে মাঠের রাস্তায় পড়ে সকলে একটু বিশ্রাম করে নিল। সঙ্গে জলযোগের ব্যবস্থাও ছিল। ভোলানাথকে তারা যত্ন করে খেতে দিল।

মাধব দাস বললেন—আমাদের দলে থাকবে তুমি ?

হাঁ।

তোমার গলার আওয়াজ দেখছি খুব মিষ্টি, আমাদের কাছে থেকে কের্তন শিখবে, কেমন ? ঘরে তোমার কে আছে ?

সৎমা।

সৎমা ? ওঃ—তাইতেই। এবার বুঝতে পেরেছি। আমাদের কাছে তুমি ভালই থাকবে, কেনো কষ্ট নেই। ঘর দেবো থাকবে—খাবার দেবো, কিছুই খরচ নেই ; অথচ এখানে ওখানে বেড়াতেও পারবে।

কৃতজ্ঞতায় ভোলানাথের চোখ সজল হয়ে উঠলো। সে বল্‌ল—আপনারা যা বলবেন তাই শুনবো।

আশু বৈরাগী বল্‌ল—হাত খরচের জন্যেও আট্‌কাবে না।

সকলেই ভাল লোক।

ভোলানাথ বল্‌ল—আপনারা এখন কোথায় যাবেন ?

যাবো যেখানে সেও এক বোষ্টমের বাড়ী। মাসে একবার করে সেখানে গিয়ে আমাদের কের্তন গেয়ে আসতে হয়। তারা বড় ভক্ত লোক।

আবার সকলে উঠে ইষ্টিশানের পথে চলতে লাগলো। পথ আর বাকি ছিল না। গোটা দুই কাশের জঙ্গল পার হতেই

ইষ্টিশান নজরে পড়লো। গাড়ী ছাড়বার সময় বুঝেই তাঁরা এসে ছিলেন সুতরাং বেশী অপেক্ষা করতে হলো না।

ট্রেণ যখন ছাড়লো ভোলানাথ তখন ভাবছিল আবার কেমন করে কোন পথে তার জীবন আরম্ভ হবে কে জানে! নিজের গ্রামের কথা তার মনে হচ্ছিল। সেই ঝাউবন, দেবদারুর সারি, সেই নদীটির তীর, ছোট পাঠশালাটি! সৎ-মার কথা মনে হতে লাগলো,—তিনি যেমনই হোন্, তিনি মা। তাঁর প্রতি একটি কর্তব্য আছে!

*   *   *   *

ছোট্ট একখানি গ্রাম; শহর থেকে বেশী দূরে নয়। কবে নাকি শ্রীচৈতন্যদেব এখানে এসেছিলেন; বৈষ্ণবদের তাই এটি তীর্থস্থান বললেও চলে।

বাড়ীর সুমুখে এক টুক্‌রো জমিতে গুটি কয়েক গাছ পালা দেওয়া আছে। গোটা কয়েক ফুলের চারাও দেখতে পাওয়া গেল। দলবল নিয়ে বাড়ীর দরজার কাছে আসতেই বাড়ীর কর্তা অবিনাশ আদর আপ্যায়ন করতে এলেন। সকলের আনন্দের মাঝখানে একবার খোল-করতাল বেজে উঠলো। ভেতরে ঢুকে সকলে আসর জাঁকিয়ে বসলেন। ভোলানাথও এসে একটি পাশে সসংকোচে বসে পড়লো।

অবিনাশের বয়স অনেক হয়েছে; দেখতে কিন্তু রোগা বেঁটে ছোট খাটো মানুষটি। চোখ দুটি গৌরাঙ্গ ভক্তিতে একেবারে ঢুলু ঢুলু; মুখে তাঁর কীর্তনের পদ লেগেই আছে। ভোলানাথকে দেখে তিনি বললেন—রাধেকৃষ্ণ, হরি হরি বল! আচ্ছা গোঁসাই, ও ছেলেটি কে? গলায় ত কণ্ঠী নেই?

গোঁসাই ভোলানাথের সকল কথাই একে একে বললো। অবিনাশ বললেন—এসো তুমি বাড়ীর ভেতর দাদা। ছেলে মানুষ লজ্জা করো না—নমো শ্রীগৌরাঙ্গ!

অন্দর মহলে ঢুকতেই একটি বয়স্থা মেয়ে এসে ভোলানাথের হাত ধরে বল্‌ল—ভেতরে ঢুকতেই তোমায় দেখেছিলাম ভাই, আমার কাছে তুমি লজ্জা করো না। করবে না ত ?

ভোলানাথ বল্‌ল—না।

সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মেয়েটি ভোলানাথকে খেতে বসালো। পরে পাখা দিয়ে বাতাস কর্‌তে কর্‌তে বল্‌ল—আমাকে দিদি বলে ডেকো—কেমন ?

মেয়েটির গলায় কণ্ঠী, কথাবার্ত্তাও ঠিক বৈষ্ণবদের মত, কিন্তু এমন চমৎকার মেয়ে ভোলানাথ আর কখনো দেখে নাই, ঠিক যেন রাজরাণী। মেয়েটি অবিনাশের স্ত্রী।

খাওয়া হয়ে গেলে নিজের হাতে মেয়েটি ভোলানাথের মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়ে বল্‌ল—পান একটি তোমায় খেতেই হবে ভাই।

পান একটি খাইয়ে হাত দিয়ে ঘিরে সে ভোলানাথকে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে পরিস্কার বিছানায় শুইয়ে দিল। বল্‌ল—এখন একটু ঘুমোও ভাই, শরীরটা সুস্থ হোক—তারপর গল্প করবো। না না, বাইরে গিয়ে ওদের কাছে এখন বসতে হবে না—অত ভক্তিতে আর কাজ নেই! ছেলে মানুষের পক্ষে এসব খুব ভাল দেখায় না।

ভোলানাথ শুধু বল্‌ল—দিদি ?

দিদি তার মুখের ওপর মাথাটি রেখে বল্‌ল—একটু ঘুমোও ভাই, আমি বসে বসে বাতাস করি।

ভোলানাথের ক্লান্ত শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছিল কিন্তু ঘুম তার চোখে আজ আর কিছুতেই এল না। বুকের ভেতরকার আনন্দ সমুদ্রের মত তাকে যেন তোলপাড় করছিল কিন্তু সে নিঃশব্দে দিদির দিকে তাকিয়ে রইল।

বাতাস করতে করতে দিদি বল্‌ল—বাড়ীময় দিনরাত এই ধর্ম্মের ছড়াছড়ি আমারও তেমন ভাল লাগে না ভাই। কিন্তু

তা বলে তোমার জামাইবাবু ত আর শুনচেন না! ওঁদের সুরে আমাকে সুর মেলাতেই হবে—এই নিয়ম, বুঝলে ভাই?

ভোলানাথ কোন কথা বলল না, শুধু দিদির মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

বাইরে তখন নানা গোলামালের মধ্যে অতিথিদের খাওয়া দাওয়া চলছিল। কীর্তন আরম্ভ হতে আর দেরি নেই। আশু বৈরাগী বল্‌ল—কই হে গোঁসাই, ক্ষুদে বামুনটি আমাদের গেল কোথায়?

গোঁসাই বল্‌ল—বৌ-ঠাকরুণ তাকে অন্দরে নিয়ে গেছেন।

সে কি, আমাদের চেয়ে তার খাতির বুঝি বেশি হল, না কি বল অবিনাশ?

অবিনাশ বল্‌ল—ছেলে মানুষ কিনা তাই।

ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে জবাব এল—শুধু ছেলেমানুষ নয়, ভাই বলেও তার আর একটা দাবী আছে। এ কথা ওঁদের বুঝিয়ে দাও।

গোঁসাই যেন একটু গরম হয়ে ঈষৎ হাসি মুখে এনে বল্‌ল—ভাইটি খানিক আগে ছিল কোথায়, বল্‌তে পারো অবিনাশ? আমরা যদি তাকে পথ থেকে তুলে না আনতাম তাহলে—

আশু গোঁসাইয়ের কানে চুপি চুপি বল্‌ল—বয়স অল্প কিনা তাই নেমকহারাম হতে বেশি দেরি লাগে না, বুঝলে হে?

মাধব দাস বল্‌ল—লোকের বাড়ী বসে আর এ নিয়ে বেশি কথাবার্তা বলো না দাদা। ছোঁড়াটা আমাদের সঙ্গে আবার যখন ফিরে যাবে তখন বেশ করে ধমক দিলেই চল্‌বে।

সেই ভাল। বলে সকলে তখনকার মত চুপ করে গেল।

কীর্তন আরম্ভ হল। আশপাশের প্রতিবেশী আর পাড়ার লোক এসে ভিড় করে দাঁড়াল। দিদি দরজার কাছে এসে বসলো। ভোলানাথ বসে রইল তারই কাছে দরজার গোড়ায়।

এ দলের কীর্তনের খ্যাতি আছে। প্রত্যেকেই নানা ভঙ্গীতে নেচে হেসে কেঁদে আপন আপন কসরৎ দেখাতে লাগলো।

দু' একজন ভাবের ঘোরে নাচতে নাচতে আবার মাটীতে লুটিয়ে লুটিয়ে গোঁ গোঁ করতে শুরু করে দিল। আশু বৈরাগীর মত ভক্ত বৈষ্ণব নাকি আর দলের মধ্যে একজনও নেই। গৌরাঙ্গ দেব তারই ওপর 'ভর' করেন প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

অবিনাশ চোখের জল মুছে বল্‌ল—বোরেগী তুমিই ধন্য!

মাধব দাস আড়চোখে একবার আশুর দিকে চেয়ে বল্‌ল—ওরকম একদিন আমারও ছিল, বুঝলে অবিনাশ? বয়সের সঙ্গে সে জোর চলে গেছে।

অবিনাশ বল্‌ল—হাঁ ভায়া, আমারও তাই। বয়েস বেড়ে গিয়ে ভক্তিটা যেন কমে গেছে! হরি হরি বল! নমো শ্রীগৌরাঙ্গ!

আশু বৈরাগীর জ্ঞান তখনও ভাল করে হয়নি। চোখ দুটো যেন তার কোনো পরম বস্তুর সন্ধান পেয়েছে—এমনি ঢুলু ঢুলু!

ভোলানাথ তার অবস্থার দিকে চেয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। লোকটা মরে যাবে নাকি?

অন্যান্য উপস্থিত সকলে মিলে তখন প্রাণপণে খোল করতালের সঙ্গে চীৎকার করে কীর্তন গানে মত্ত ছিল।

তারপর সেই ভয়ানক কীর্তন শেষ হলো। হলো যখন তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। আহারাদির সময় দেখা গেল আশু বৈরাগীর জ্ঞান বেশ ভাল করেই ফিরে এসেছে। তা ছাড়া তার আর একটা গুণ আছে—খেতে বসে তার কোনোরূপ লজ্জার বালাই আসে না। গান গল্প হাসির সঙ্গে সকলের ভোজন সেদিনকার মত সাঙ্গ হলো।

সকাল বেলা সকলের বিদায়ের পালা।

সকলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতেই গোঁসাই বল্‌ল—কই হে ভোলানাথের যে এখনও হয় না।

অবিনাশ একটু আড়ালে চলে গেল। আশু ডাক্‌লো—ভোলানাথ?—এর পরে আমাদের গাড়ী ছেড়ে যাবে যে?

ভেতর থেকে খবর এল, ভোলানাথের যাওয়া হবে না। এইখানেই সে থাকবে।

গোঁসাই বল্‌ল, তার মানে? চেনা নেই, পরিচয় নেই, এখানে সে থাকবে কেমন করে? তা ছাড়া সে যে আমাদের দলে ভর্তি হয়েছে। কই সে, গেল কোথায়?

এমন সময় দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দিদি বলল—আপনারা যান্ আজকের মত, তার শরীরটা ভাল নেই—এখন একটু শুয়ে আছে, ডাক্তার দরকার নেই। তার হয়ে আমিই আপনাদের প্রণাম জানাচ্ছি।

বাড়ীর গৃহিনীর কথা—সুতরাং মানতেই হবে। সকলে গোঁজ গোঁজ করে অনেক কথাই বলতে লাগলো। ভক্ত বৈরাগী বল্‌ল, ছেলেটা ভাল কি মন্দ সেটা ত আপনারা কিছুই জানেন না, যদি কিছু হাত সাফাই করে পালায় তখন কাকে ধরবেন?

দিদি যাবার সময় কঠিন কণ্ঠে বলে গেল—আচ্ছা তার জন্যে আপনাদের ভাবতে হবে না—আমি সেটা বুঝে নিতে পারবো। বলে সে ভেতরে চলে গেল।

কী আর হবে! ছেলেটা হাতছাড়া হয়ে গেল! ভবিষ্যতে কীর্তন শিখিয়ে তার দ্বারায় কিছু রোজগার করা চল্‌ত বটে! অনেকেই কটূক্তি কর্‌লো, বৈষ্ণবদের মুখে সে সকল উচ্চারণ করা উচিত নয়। কিন্তু স্বার্থে আঘাত লাগলে সকলেই এরকম কথা বলে।

আস্তে আস্তে সকলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

* * * *

তা নেহাৎ মন্দ হলো না! ভোলানাথ সত্যিই এখানে রয়ে গেল। পথের পাওয়া দিদির কাছে এক একটি দিন ভারি চমৎকার কাটতে লাগলো। পর যখন আপনার হয় তখন আত্মীয়ের চেয়েও সে বেশী আপন হয়ে ওঠে। ভোলানাথের পীড়িত জীবন আবার আনন্দে মুখর হয়ে উঠলো।

সমস্ত দিনের সকল কাজেই ভোলানাথ দিদিকে সাহায্য করে। এখন আবার সে ইস্কুলে যেতে আরম্ভ করেছে। দিদিই খরচ-পত্র দিয়ে তাকে স্কুলে পাঠায়। স্কুল থেকে ফিরে এসে আর সে দিদির কাছছাড়া হয় না।

এই আনন্দের মাঝে একটি জিনিষ তাকে পীড়া দেয়। লক্ষ্য করে দেখতো, অবিনাশবাবুর সঙ্গে দিদির বনিবনা একটু কম। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যদি সদ্ভাব না থাকে তবে সে সংসারে নিত্য অশান্তি—একথা এই বয়সেই ভোলানাথ কি রকম করে যেন বুঝতে পারে। রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে কোনো কোনো দিন সে যেন শুনতে পায়, পাশের ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে প্রচণ্ড কলহ সুরু হয়ে গেছে। ঝগড়াটা বাড়ে বৈ কমে না। শেষকালে আর্তনাদ, চোখের জল প্রভৃতির নানারকমের আভাস কানে আসে। সকাল বেলা উঠে ভোলানাথ দেখে, দিদির মুখখানি ফুলেছে, চোখে জলের দাগ,—একদিন দেখা গেল কাঁধের কাছে যেন একটা কালশিরে পড়ে আছে।

ভোলানাথ বল্‌ল – দিদি ?

দিদি একটুখানি হাসল। বল্‌ল—কিরে ?

তোমার কি হয়েছে দিদি ?

দিদি একটুখানি গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—আমার কি হয়েছে না হয়েছে সে সব কথায় তোর দরকার নেই ভাই !

ভোলানাথ সেদিন নীরবে ইস্কুলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু অবিনাশকে সেই থেকে সে আর ভাল চোখে দেখতে পারল না। যত বড় আশ্রয়দাতাই সে হোক না, দিদিকে সে যখন এমন অপমান করতে পারে, তখন কোন শ্রদ্ধাই তাকে আর করা চলে না! দেখা হলেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে! অবিনাশ কিন্তু তার ওপরে কোনো অন্যায় ব্যবহার করে না। দেখা হলে একটু হেসেই বলে—কি হে ছোক্‌রা, আজকাল কি রকম লেখা পড়া হচ্ছে ?

ইস্কুলে যাচ্ছ ত? বেশ—বেশ!—বলেই তিনি কোনো কাজে বেরিয়ে চলে যান।

ভোলানাথ তার দিকে চুপ করে চেয়ে থাকে। দিনের বেলা যে লোক এত ভদ্র আর শান্ত, রাত্রে সে এমন ভয়ংকর হয়ে ওঠে কেন? অথচ এদিকে বৈষ্ণব, হরিভক্ত, এবং দিন রাত কীর্তন নিয়েই থাকে!

দিন যায়। দিদির জীবনে অশান্তির মাত্রা প্রতিদিনই যেন বেড়ে ওঠে। প্রতি মাসে মাসে আজকাল কীতন আর হয় না—সংসারে দারিদ্র্য বেড়ে উঠেছে। খরচ পত্র নিয়ে অশান্তি লেগেই আছে। এই ভাবে কিছুদিন চলবার পর ভোলানাথ ইস্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। বাড়ী ফিরে এসে সে দেখলো, দরজার কাছে বসে দিদি চোখের জল ফেলছে। শুকনো মুখখানির ওপর মনে হলো, জায়গায় জায়গায় প্রহারের দাগ। কাপড়ের ভেতর থেকে বাঁ হাত খানা বেরিয়ে পড়েছিল, ভোলানাথ দেখতে পেলো, প্রকাণ্ড একটা কালশিরার দাগ সেখানে ফুলে উঠেছে। সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে দেখতে যেন চোখের সুমুখে অন্ধকার হয়ে এল। সেইখানে বসে পড়ে সে বল্‌ল—দিদি! ও দিদি?

ভোলানাথের দুটি হাত কাছে টেনে নিয়ে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে দিদি বলল—কিছু জিজ্ঞেস করিস নে ভাই, কোনো কথা বলতে পারবো না,—আগে বড় হ!

ভোলানাথ বল্‌ল—তিনি কোথায়?

দিদি বল্‌ল—নেই, চলে গেছেন।

কেন?

তা জানিনে, কিছুদিন এখন আর আসবেন না!

সেদিন রাতে আকাশে চাঁদ উঠেছিল। ছাদের ওপর দিদির কোলে মাথাটি রেখে ভোলানাথ ওপর দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিল। এক সময় বল্‌ল—আচ্ছা দিদি, আমি আসবার আগে কি তোমার এমনি করেই চলতো?

হ্যাঁ ভাই, ঠিক এমনি করে। এখন তোর সঙ্গে কথা বলতে পাচ্ছি, তখন শুধু ভগবানের দিকে চেয়ে থাকতাম।—বলতে বলতে আবার দিদির গলা ধরে এল।

ভোলানাথ বলে উঠলো—দিদি, ভগবান আমাদের জন্য নয়,—যাদের কেউ নেই, ভগবান তাদের দয়া করেন না। আমরা ছাড়া আর কেউ নেই আমাদের।

আরো কি একটা কথা তার গলার কাছে ঠেলাঠেলি করতে লাগলো, কিন্তু মুখ ফুটে সে বলতে পাচ্ছিল না। শুধু অবরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌ল—তোমার মত লোককেও যে দুঃখু সইতে হয়, এ কথা আমি জানতাম না দিদি।

সেদিনকার নিবিড় চন্দ্রালোকের তলায় বসে দুটি অসহায় ভাই-বোন অনেকক্ষণ ধরে অশ্রুত্যাগ করেছিল।

কিছুদিন গেল, অবিনাশ আর ফিরলো না। সংসারে অভাব ক্রমেই বেড়ে উঠলো। দিন যেন আর চলে না। একটা চালের গদিতে ভোলানাথ একটি কাজ যোগাড় করলো। ছয় টাকা মাসে মাইনে আর রোজ আধ সের করে চাল। তাতেই অতি কষ্টে এক বেলা এক মুঠো খাওয়া চলে। সকাল আটটায় খেয়ে বেরোয় আর ফেরে সেই সন্ধ্যায়।

দিন দিন দিদির মুখখানি শুকিয়ে ওঠে। কথা কইতে গেলে চোখ দুটি যেন ছল্ ছল্ করে আসে। সেই সুন্দর চেহারায় কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। বুকের ভেতরটায় কোথায় যেন তার ভেঙে গেছে—সে খোঁজ আর পাবার কোন উপায় নেই। দিদি তেমন করে আর এক সঙ্গে অনেকগুলি কথা বলে না; একটি কথা বলেই হাঁপায়,—মনে হয় তার মন যেন বহুদূরে চলে গেছে। দিদি আগে ছিল চঞ্চল, সারাদিন ছুটোছুটি করে কাজকর্ম করতো; আজকাল তার পা যেন আর চলতে চায় না, মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে বসে বিশ্রাম করে, ক্লান্ত দেহখানি ছড়িয়ে দিয়ে এক এক বার শুয়ে পড়ে।

অনেক দিন এমনি ভাবে চলার পর দিদি একদিন বল্‌ল—আর পারিনে ভাই—এবার আমাকে ছুটি দে।

ভোলানাথ বল্‌ল—সে কি দিদি, কোথায় যাবে?

দিদি বলল, আমার মামীমার ওখান থেকে দিন কয়েকের জন্য ঘুরে আসি। তুই ভাই এখানে কোথাও থাকিস্, চাকরি নিয়মিত বজায় রাখিস, আবার আমি ফিরে আসবো।

ভোলানাথ বলল—চলে যাবে?

আবার আসবো ভাই।—বলে দিদি তার চিবুকে হাত দিয়ে চুম্বন করল। ভোলানাথের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

পরদিন যাবার ঠিক হলো। চালের গদির কাছাকাছি ছোট্ট একখানি খড়ো ঘর ভোলানাথ নিজের জন্য ঠিক করে এল। এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। সামান্যই জিনিষপত্র, দিদি বাঁধাছাঁদা সুরু করে দিল। অপরাহ্ণ বেলায় যাত্রা।

দিদি যেন কেমন করে উদাসীন হয়ে গেছে। নিজের সাজানো ঘরটির মধ্যে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে চেয়ে বল্‌ল—এসব কিছুই আর আমার দরকার নেই ভাই! কি কাজে আসবে এসব—সখ মিটে গেছে! এত জিনিষপত্র নিয়ে কোথায়ই বা যাবো!

আকাশ যেন হাতছানি দিয়ে দিদিকে ডাকছে, দিদি তাই এই অল্প বয়সেই সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে।

দেয়াল থেকে দিদি দামী ছবিগুলো খুল্‌লো, তাকের ওপর থেকে ফুলদানীগুলি, আলমারীর মাথা থেকে কাঁচের কতকগুলি বাসন, খান কয়েক বহুমূল্য জামা কাপড়, কতকগুলি পুতুল—আরও কয়েকটি সৌখীন জিনিষপত্র এক জায়গায় জমা করে দিদি বল্‌ল—এগুলো সব তোমায় দিয়ে গেলাম ভাই, এদের দিকে চেয়ে এক একবার আমাকে মনে করিস—কেমন?

মুখে হাত চাপা দিয়ে আর্তকণ্ঠে ভোলানাথ বলে উঠলো—আর বলো না দিদি, আর আমি সইতে পাচ্ছি না!

দিদি আঁচলে চোখ মুছে বল্‌ল—সইতে কি আমিই পাচ্ছি ভাই, তবু আমাকে সব ছেড়ে যেতেই হবে। পুরুষ মানুষ হয়ে তোরা অনেক জায়গায় অনেক সহ্য করিস তা জানি কিন্তু আমরা একটি জায়গায় যে দুঃখ পাই তাদের তুলনায় তোদের ওসব কিছুই নয় ভাই।—চল্‌ তোর ঘরটা ভাল করে গুছিয়ে দিয়ে আসি!

সময় আর বেশী ছিল না। দুই ভাই-বোনে জিনিসপত্র নিয়ে বেরোলো। পথ দিয়ে হেঁটে এসে নতুন খড়ো ঘরে ঢুকে দিদি ভোলানাথের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিল।

অপরাহ্ন বেলায় একাকিনী দিদি যখন দক্ষিণের পথে ট্রেণে চড়ে বসলো, ভোলানাথ তখন শূন্যদৃষ্টিতে একদিকে চেয়ে আছে। দিদি বল্‌ল—অনেক কথাই বলা হলো না ভাই—আগে তুমি বড় হও তখন দিদির কথা জানতে পারবে। আজ চললাম।

ততক্ষণে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে।

* * * *

তারপর অনেকদিন চলে গেছে। দিদির কথা ভোলানাথের যখনই মনে পড়েছে তখন সে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়েছে, আমি তাঁকে না দেখতে পাই তার জন্যে দুঃখু নেই কিন্তু দিদি আমার সুখী হোক, হে ভগবান দিদির ব্যথা আমি সইতে পারি না।

কিন্তু বেদনা তাকে সইতে হয়েছে! ভগবানের প্রতি এই অবিচল বিশ্বাসই তাকে চিরদিনের জন্য পথহারা করে রেখেছে। আজকাল ভোলানাথের আর সে চাকরিটি নেই, চালের সে গাদটি ফেল্‌ হয়ে যাবার পর তাকে কাজটি ছাড়তে হয়েছে; কোনদিন কোথাও সে একমুঠো খেতে পায়, পথের ধারে যেখানে সেখানে রাত কাটায়—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে টো টো করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। লোকের কাছে দয়া চাইতে তার ইচ্ছা করে না, পাছে তাকে আশ্রয় দিয়ে অদৃষ্টের ফেরে আবার কেউ বিপদে

পড়ে। দিদির কথা সে ভাবে, তিনি এখন কোথায়? ঠিকানা জানে না নৈলে একদিন সে অবশ্যই দিদিকে দেখতে যেতো। অবিনাশের কোনো সংবাদ আজ অবধি পাওয়া যায় নি—সেই শোকটাই দিদিকে সন্ন্যাসিনী করে গেছে!

বহুদিন পরে হঠাৎ কেমন করে সংবাদ পাওয়া গেল দক্ষিণ দেশে কোথায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, লোক খেতে পাচ্ছে না। অতি বৃষ্টিতে সমস্ত ভেসে গেছে। হাজার হাজার লোক মরেছে; এখনও যারা বেঁচে আছে তারা নাকি গাছতলায় বসে গাছের পাতা সিদ্ধ করে খেয়ে জীবন ধারণ কচ্ছে। যাই হোক, সেই বিপদাপন্ন নর-নারীকে সাহায্য করবার জন্য কয়েকটি লোক চাই—স্থানে স্থানে তারই জন্য সংবাদ আনাগোনা করছে।

ভোলানাথের তখন কোনো কাজ ছিল না। সে গিয়ে কোথায় স্বেচ্ছাসেবকের খাতায় নিজের নাম লিখিয়ে এল। কাল সেখানে যেতে হবে।

কয়েকটি ছোক্‌রা মিলে একটি দল তৈরী হল। দলের যিনি কর্তা তাঁর ওপরেই সমস্ত দেখা শোনার ভার পড়লো। তিনিই এদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। পরদিন ইষ্টিশানে গিয়ে গাড়ীতে সকলে উঠলো। ভোলানাথ একপাশে গিয়ে বসে রইল।

খবরের কাগজে যা প্রকাশ, ঘটনা তার চেয়ে আরও নিদারুণ। সমস্ত পরগণাটা অতিবৃষ্টিতে একেবারে ভেসে গেছে। শত শত গ্রামের কোনো চিহ্নই নেই। রেলের লাইনগুলি জলের তোড়ে গোড়া থেকে উপড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কত অসংখ্য নরনারী যে ডুবে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। গরু ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু অসহায়ভাবে প্রাণত্যাগ করেছে। তাদের গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে আর অগ্রসর হবার উপায় নেই। যেখানে জল একটুখানি সরে গেছে সেখানে গৃহহীন উপবাসী নরনারীগণ ভিড় করে দাঁড়িয়ে কোনো আগন্তুকের অপেক্ষা করছে।

ছোকরাদের দল যেখানে গিয়ে নামলো সে একটি ছোট্ট ইষ্টিশান। সেখানে নৌকো পাওয়া গেল, দুতিনখানি নৌকোয় চড়ে তারা সকলে মিলে বন্যাপ্লাবিত স্থানসমূহে চালডাল নুন কাপড় কম্বল প্রভৃতি বিতরণ করতে করতে এগিয়ে চললো। সে ভয়াবহ দৃশ্যের কাছে যেতে ভোলানাথের সর্বাঙ্গ ধক্ ধক্ করে কাঁপতে লাগলো। মা বাপ ছেলে বিক্রী করতে চাইছে, কেউ কাঁচা গাছের পাতা চিবোচ্ছে, কোথাও বা সামান্য এক টুকরো কাপড়ের জন্য মারামারি লেগে গেছে, আবার কোথাও প্রিয়জনের শোকে কেউ বসে বসে অঝোরে কান্না লাগিয়েছে। কারো প্রতি কারো দয়া মায়াও নেই, ভ্রুক্ষেপও নেই! সবাই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাঁচতে চায়। এদেরই ভেতর দিয়ে ভোলানাথ দেখতে দেখতে চল্লো।

কোনো কোনো গ্রামের যে জায়গাটা একটু ঢালু, সেখান থেকে জল একটু সরে গেছে। সেখানে দেখা গেল, একটি গাছতলায় একটি মরা কচি ছেলের পাশে তার মা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে। অদূরে একটি বৃদ্ধের মৃত দেহ ফুলে ফেঁপে এক জায়গায় পড়ে রয়েছে। ভোলানাথ তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে স্ত্রীলোকটিকে তুলে বাঁচাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরেই মহিলাটি মারা গেল। ঔষধপত্র সকলের কাছেই ছিল, কিন্তু তা দিয়ে আর ক'জনকে বাঁচানো যেতে পারে! তাছাড়া ঔষধপত্রের চেয়ে অন্নবস্ত্রের সাহায্য আর শুশ্রূষার লোকের একান্ত দরকার! শুশ্রূষার কাজে প্রায় সকল ছোকরাই লেগে গেল। নৌকোর ওপর চারদিক থেকে বিপন্ন নরনারীকে তুলে আনা হতে লাগলো। তাদের দিকে চাইলে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। একখানা গ্রাম যেন একটি প্রকাণ্ড হাসপাতাল হয়ে উঠলো। মৃত্যুর এই ভয়াবহ লীলার মাঝখানে ভোলানাথ চুপ করে রইলো। এই উৎপীড়িত ছন্নছাড়া নরনারীদের দিকে চেয়ে তার মনে হলো এদের এই এতবড় দুঃখের কাছে তার দুঃখের কোনো মূল্যই নেই।

দিন দুই অতিরিক্ত কষ্ট আর অতিরিক্ত পরিশ্রমে কেটে গেল। জল খানিকটা কমে গেছে বটে কিন্তু দুর্ভিক্ষ ততোধিক পরিমাণে দেখা দিয়েছে। দেশবিদেশ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করাও হচ্ছে, নানাদিক থেকে অন্নবস্ত্রের আমদানিও চলছে। স্থানে স্থানে শবদাহ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ডাক্তার ঔষধ-পত্র বিতরণ করছে। চারদিকে মহামারী ক্রমেই বেড়ে উঠছে।

তাঁবু যেখানে বাঁধা হয়েছিল তার কিছু দূরেই একখানি কুঁড়ে ঘর কোনোরকমে বন্যার গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করে কোমর ভেঙে দাঁড়িয়ে আছে। দুই একটি রোগী সেখানে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় এখনও বেঁচে রয়েছে। দলের যে ছেলেটির নাম রাখাল তার ওপর ভার ছিল, রাত্রে ওই রোগী দুটির তদ্বির করা। কিন্তু তার শরীর একটু খারাপ হওয়ায় কাজটা এসে পড়লো ভোলানাথের ওপর। খানিক রাতে কোনো রকমে আহারাদি সেরে হাতে একটি আলো আর লাঠি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো। চারদিকেই তখন স্বেচ্ছাসেবকদের গোলমাল শোনা যাচ্ছে, সুতরাং ভয়ের কিছু ছিল না। ফাঁকা জায়গা হলেও পথে কুকুর শেয়াল অথবা বড় বড় ইঁদুরের মরা দেহ পড়ে থাকায় হাওয়া দুষিত হয়ে উঠেছে।

আলোটা রেখে ভোলানাথ ঘরের মধ্যে ঢুকলো। আহা বেচারা! একে স্ত্রীলোক তার ওপর কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। অতি কষ্টে প্রাণটুকু শুধু এখনও ধুক্ ধুক্ করছে। মানুষের জীবনের যে কোনো মূল্যই নেই তা এই বন্যাপীড়িত দেশে একবার এলেই বেশ বুঝতে পারা যায়। আলোটা মাথার কাছে রেখে ভোলানাথ বসে পড়ে বল্‌ল—কেমন আছ?

না সাড়া না শব্দ! মুখখানার কেমন কদর্য বিকৃত চেহারা! ভোলানাথ একটু ভয় পেয়ে গেল। মুখের কাছে আলোটা ধরে সে ডাক্‌লো—শুনছো?

স্ত্রীলোকটি ভাল করে যখন চোখ চাইল, ভোলানাথের হাত

তখন কেঁপে উঠেছে। চোখে যেন কেমন করে তার ধাঁ ধাঁ লেগে গেল!

দিদি!

আলোটা রেখে দুই হাতে দিদির মুখখানি ধরে ভোলানাথ এক অস্বাভাবিক কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো—দিদি, এ কি হল তোমার? এখানে কেমন করে এলে?

মৃদু অস্পষ্টস্বরে দিদির গলা থেকে আওয়াজ বেরোলো—তোকে দেখবার জন্যই ভাবছিলাম—ভালো আছিস ত?

না নেই, একটুও ভাল নেই, তোমাকে নৈলে আর আমার চলছে না দিদি। তুমি ফিরে চল!

দিদি বোধহয় একটু হাসবার চেষ্টা করলো, পারলো না। শুধু বলল—জলের ওপর ভাসতে ভাসতে যখন আসছি তখনও তোর কথা ভাবছিলাম কিন্তু আর আমার দেরী নেই ভাই। আমার কথা তোকে কিছুই বলা হলো না, কিছু মনে করিসনে দাদা।

বাঁচাবার জন্য অনেক চেষ্টা করা গেল, দিদি কিন্তু আর একটি দিনও বেঁচে রইলো না। সেই রাত্রিশেষেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেল। ভোলানাথ হঠাৎ যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল—কাঁদলোও না কোনো মন্তব্যও করলো না। নিজে কোথা থেকে কাঠ কেটে আনলো, চিতা প্রস্তুত করলো, কাঁধে করে দিদির মৃতদেহ এনে চিতায় শুইয়ে দিল এবং আগুনটাও ধরালো সে নিজে। সেই সোনার দেহ যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, কোনো চিহ্নই যখন আর রইলো না—তখন সে উঠে আস্তে আস্তে ডাঙার পথ ধরে ইষ্টিশানের দিকে চলে গেল। কোথায় গেল, কেন গেল—কেউই জানলো না!

* * * *

বছরের পর বছর ঘুরে গেছে। ভোলানাথ এখন একেবারে

একা। এ রকম একাকী থাকায় বেশ একটা সুবিধে আছে। কোথাও কারো সঙ্গে এতটুকু বাঁধন নেই। রোগ হলে কেউ সেবাও করে না, অনাহারে থাকলে কেউ জিজ্ঞাসাও করে না! কতদিন ভোলানাথের পথে পথে কেটে গেছে; রাত্রে একটু ঘুমোবার স্থান খোঁজবার জন্য তাকে অনেক পথ হাঁটতে হয়েছে। সামান্য কিছু খাবার সংগ্রহ করবার জন্য তাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। অনেকে তাকে আশ্রয় দিয়ে আবার তাড়িয়ে দিয়েছে; আহার দিয়ে লাঞ্ছিত করেছে; আবার উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপমানও করেছে।

অনেকদিন পরে তাকে কোনো একটা তীর্থস্থানে দেখা গেল। প্রধান পাণ্ডার সহকর্মী হয়ে সে তখন পথ থেকে যাত্রীদের ধরে আনে। এ কাজ সে তেমন ভাল জানতো না, তবু তার সরল অনুরোধ এড়াতে না পেরে দু একজন যাত্রী আসতো বটে কিন্তু অন্য লোকে তার এই সৌভাগ্য দেখে নানা ফন্দিতে কাজটা তার হাতে নিল। ক্রমশ তার দ্বারায় আর কাজ হয় না, প্রধান পাণ্ডা তাকে ছাড়িয়ে দিল। কিন্তু এ তীর্থস্থানটি ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছা হলো না, ফুলের মালা বিক্রী করে দিন চলতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-কাজও রইলো না; যাত্রীর যাতায়াত কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মালা বিক্রী বন্ধ হয়ে এল।

আবার তাকে পথে নেমে আসতে হলো। কোনো রকমে ছোটখাটো একটি কাজ নিয়ে এমনি করে সংসারে টিকে থাকার চেষ্টাই সে করেছিল কিন্তু অদৃশ্য দুর্ভাগ্য কেবলই তার সকল অবলম্বন ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন পাছে তার ছোঁয়াতে কারো অমঙ্গল হয় এজন্যে অন্য লোকের কাছে কোনো উপকার পর্যন্ত নেওয়া সে বন্ধ করে দিয়েছে।

নিরুদ্দেশ হয়ে কোথাও চলে যাওয়াটা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। একবার একটা বড় রেল ইষ্টিশানে একজন বিদেশী

লোকের সঙ্গে হঠাৎ তার কেমন করে আলাপ হয়ে গেল। লোকটা দেশে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ফিরে চাকরি স্থানে চলে যাচ্ছে। কোন্ একটা বন্দরে জাহাজ ভিড়েছে, সেই জাহাজেই লোকটা চাকরি করে। চেষ্টা করলে ভোলানাথকে বন্দরে একটা কাজও জুটিয়ে দিতে পারে—একথাও বল্‌ল।

তাই ঠিক হলো। কোথাও যাবার কোনো বাধাই ভোলানাথের ছিল না। ঝরাপাতার মত হাওয়ায় হাওয়ায় সে এখন যেখানে সেখানে উড়ে উড়ে বেড়াতে পারে। বাবুটি দয়া করে তাকে একটি ট্রেণের টিকিট কিনে দিল। বল্‌ল—খাবারের কথা ভেবো না, আমিই চালিয়ে নেবো।—কৃতজ্ঞতায় ভোলানাথের চোখে তখন জল এসে পড়েছে। ট্রেণে চড়ে বহুদূর যেতে হবে, যেমন তেমন করে অন্তত একহাজার মাইল রাস্তা। শুয়ে বসে, নানাকথা ভেবে সময় আর কিছুতেই কাট্‌তে চায় না। জান্‌লার বাইরে চারদিক যেন তেপান্তরের মাঠ। এর কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ কিছুই জানবার উপায় নাই। বাবুটি আর একটি বেঞ্চিতে আহারাদি সাঙ্গ করে এই দিনের বেলাতেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন বাইরের দিকে চেয়ে ভোলানাথ চুপ করে বসে রইলো। সেটা শরৎকাল। আকাশ চমৎকার নীল হয়ে উঠেছে, তারই নীচে পালকের মত সাদা সাদা মেঘ ভেসে চলেছে। মৃদু মৃদু ঠাণ্ডা বাতাসও আসছে। অনেক কথাই ভোলানাথের মনে হতে লাগলো। মনে হলো, সেই পুরাতন জীবনে আর একবার ফিরে যাওয়া যায় না? গ্রামের সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তার যে ক্ষুদ্র জীবন সুরু হয়েছিল, সে-জীবন যে এমন সমস্ত পৃথিবীর দিকে প্রসারিত হয়ে পড়বে,—একথা ত সে কোনোদিন জানতো না! আবার সে গাঁয়ের পথে ফিরে যেতে চায়। সেই যে আঁকাবাঁকা পথটি পাঠশালার গা ঘেঁষে, মাল্লা-পাড়ার ভেতর দিয়ে ভট্টাচায্যি পুকুরকে ডান হাতি রেখে সোজা নদীর দিকে চলে গেছে

—সেই পথখানি ছাড়া তার আর কিছু ভাল লাগে না। রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে হঠাৎ দিদির কথা তার মনে পড়ে গেল। তার সেই পরমাত্মীয়া নারীটি আজ কোথায়? আকাশের কোটি কোটি তারকার মধ্যে সে দিদিকে খুঁজতে লাগলো। সব চেয়ে উজ্জ্বল তারাটির দিকে চেয়ে তার মনে হল—সে ওই! এত উজ্জ্বল, দিদি ছাড়া আর কেউ নয়!

পরদিন অপরাহ্ণে ছোট্ট একটী ইষ্টিশানে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। ইষ্টিশানে নেমেই সুমুখে বালির চড়া বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়ে ধোঁয়ার মত আকাশের কিনারায় মিশে গেছে। বাঁ দিকে সমুদ্রের প্রকাণ্ড তরঙ্গমালা তীরের কাছে এসে ফেটে পড়ছে। নীল জল, আর সাদা ঢেউয়ের ফেণা। অবারিত সমুদ্রের ভীষণ মূর্তির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে বুকের ভেতরটা ধ্বক্ ধ্বক্ করে। কাছেই বন্দর। যাত্রীরা সেখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। অদূরে একখানা জাহাজ নোঙর করেছে। বাবুটি বললেন জাহাজ এখন ছাড়তে দু'ঘণ্টা দেরি আছে, তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি—চল।

দু'জনে বালির পথ খানিকটা অতিক্রম করে এসে একটা বড় কাফিখানার মধ্যে ঢুকলো। সেখানে পাগড়ী আর পায়জামা পরা কতকগুলি বিরাটকায় লোক বসে কাফি পান করছিল। লোক-গুলোর ভয়ানক চেহারার দিকে তাকিয়ে ভোলানাথের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সবাই যেন ডাকাতের সর্দার।

কেউ হাসছে, কেউ গল্প করছে, আবার কেউ বা পরমানন্দে গাঁজা টানছে। সবাই এরা জাহাজে কাজ করে। তাদের ভেতর গিয়ে একজনের সঙ্গে বাবুটি ভোলানাথের পরিচয় করে দিল। এইখানেই এক পাশে ভোলানাথ থাকবে আর জাহাজে মাল পাঠানো-নামানোর সময় একটু আধটু তদারক করবে। মাস মাস মাইনে পনেরো টাকা। কাজ পাওয়াটা আনন্দের কথা, কিন্তু এই

ভয়ানক নির্বাসনের কথা ভেবে ভোলানাথের মুখখানি শুকিয়ে উঠলো। ভোলানাথ সেইদিন থেকেই অত্যন্ত সন্তর্পণে এবং ভয়ে ভয়ে কাজে লেগে গেল।

তা কাজটা নেহাৎ মন্দ নয়, সপ্তাহে চারদিন খাটুনি। কাফি-খানার এক পাশে সে শোয় আর দুবেলা রুটি খায়। ভাঙা ভাঙা হিন্দি ভাষা এখন সে একটু একটু বুঝতে পারে; লোক-গুলি নানা দেশের নানা দুঃসাহসের গল্প করে,—ভোলানাথ কান পেতে শোনে! এ আবহাওয়ার মধ্যে স্নেহ মায়া মমতার এতটুকু চিহ্নমাত্র নেই, কেউ কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ পাতায় না, কেউ কারো কুশল জিজ্ঞাসা করে না, কারো অভাবে কারো আটকায় না—সবাই নিজেকে নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত। ভোলানাথ যেন একটি অপরিচিত পৃথিবীতে এসে পড়েছে। যতদূর চেয়ে দেখে শুধু সমুদ্রের ভীষণ জলরাশি আর সাদা বালির চড়া; কোথাও আশ্রয় নেই, কোথাও আত্মীয়তার চিহ্নমাত্র নেই! চিরদিনের মত সে যেন সামাজিক জীবনকে হারিয়ে বসেছে।

কিছুদিন কেটে গেছে। বাবুটি এর মধ্যে একবার এসে দেখা করে গেছেন। নিজের অবস্থার সঙ্গে ভোলানাথ এখন একটু খাপ মানিয়ে নিয়েছে। মন খারাপ হলে আগে সে সমুদ্রের চড়ার ওপর শুয়ে আকাশের তারার দিকে চেয়ে থাকতো, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতো। প্রাতঃকালে উঠে চড়ার ওপর দিয়ে সূর্যোদয়ের দিকে হেঁটে যেতো। সমুদ্রের সঙ্গে এখন তার বেশ ভাব হয়ে গেছে, ঢেউগুলো তীরের কাছে আছড়ে পড়ে এখন যেন তারই মনের কথা বলে যায়, তারই কথা বলে বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। জাহাজের কাজে এখন সে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। কাজ আর কোথাও আটকায় না। ইষ্টিশান থেকে মাল এসে জাহাজে ওঠে —আর জাহাজের মাল নামানো হলে রেলগাড়ীতে চালান যায়। যাত্রীদের নিয়ে জাহাজ ছাড়লে পর ভোলানাথ চুপ করে সেইদিকে

তাকিয়ে থাকে। সমুদ্রের ওপর বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। জাহাজ খানি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে মাস্তুলটা শুধু নজরে পড়ে; ক্রমে আকাশের রেখার সঙ্গে মাস্তুলটি মিশে যায়। ভোলানাথ ভাবে সেও যদি অমনি একদিন সাগরের পথে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ত মন্দ হয় না! তার জন্যে কেউ ভাববেও না, কেউ বাধাও দেবে না। যেদিন কাজ থাকে না সমস্ত দিনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সময় তার আর কাটতে চায় না। এক জায়গায় পা ছড়িয়ে বসে সে বালি নিয়ে ছোড়াছুড়ি করে; শামুক, সাদা জমাট সমুদ্রের ফেণা, ঝিনুক প্রভৃতি সংগ্রহ করে এনে নিজের কাছে রাখে, ঢেউয়ের সঙ্গে কখনও বা ছুটোছুটি করে মনে করে সমুদ্রই যেন তার এক মাত্র সঙ্গী। সিন্ধুপাখীর দল মাঝে মাঝে উড়ে যায়, সে অমনি তাদের গোণবার চেষ্টা করে। রাত্রে সে তারার গান শোনে, সমুদ্রের সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলে। বিগত জীবন তার কাছে যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে; দিদির কথা তার আর মনেই পড়ে না; সৎমা তার কোথায় তলিয়ে গেছে; গ্রাম নগর, সেই দেশের সেই পণ্ডিত আর তার সেই মেয়েটি ওই সমুদ্রের তলায় যেন সমাধিলাভ করেছে। ছোট কথা আর সে ভাবে না, নিজেও যেন সে মস্ত বড় হয়ে পড়েছে। সমুদ্রের সঙ্গে আকাশের সঙ্গে আর এই সুদূর বালিয়াড়ির সঙ্গে সেও যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সে যখন জেগে থাকে, দেখে—প্রকাণ্ড বিশ্বজগত; আর চোখ বুজে থাকলে দেখতে পায় অসীম আকাশ আর অগাধ সমুদ্র তার মনের মধ্যে একটি বিরাট আসন নিয়ে বসে গেছে। সে যেন মরে গিয়ে আবার নব জন্ম পেয়েছে; এখনও যেন তার শৈশব পার হয়'নি এমনি সে সাহসী প্রফুল্ল—এমনি সে উদার এবং উদাসীন! সে যেন সমুদ্রে ছোট্ট রাজা!

* * * *

কিন্তু ভোলানাথের এই সামান্য আনন্দের জীবনটুকুও বিধাতা

সইতে পারলেন না। ভোলানাথ যেন তাঁর সৃষ্টির পথে ভয়ানক বাধা।

সেটা কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। চারদিকে সমুদ্রের গর্জন ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে নারকেল পাতার ছাউনি-দেওয়া কাফিখানার ওপর দিয়ে প্রবল বেগে ঝড় বয়ে চলেছে। ঘর-খানা এমন ভাবে দুলে দুলে উঠছে যে মনে হয়, কখন বুঝি কোমর ভেঙে পড়ে। একটি আলো ভেতরে টিম্ টিম্ করে জ্বলছিল, এর মধ্যে কখন্ সেটি নিবে গেছে।

রাত বোধ করি তৃতীয় প্রহর। হঠাৎ কেমন করে না জানি ভোলানাথের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখে আগুনের ফিন্‌কিতে সমস্ত ঘরখানা ভরে উঠেছে। হঠাৎ সে চীৎকার করবার চেষ্টা করলো কিন্তু আওয়াজ ফুটলো না। বিদ্যুতের মত আগুনটা চারদিকে ঠিক যেন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। দোকানের মালিক সেই অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে এর ভেতর কখন্ উঠে পাগলের মতো ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে—বোধকরি জিনিস-পত্রগুলি বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। গায়ে আগুনের ছিটে লাগাতেই ভোলানাথ তাড়াতাড়ি উঠে লাফিয়ে বাইরে এল; এইটুকুর মধ্যেই তার গায়ে দু একটা ফোস্কা উঠে গেল।

একে সমুদ্র তীর, তার ওপর ঝড়ের হাওয়া। আগুন নেবাবার সাধ্য কারো হলো না। মুহূর্তে মুহূর্তে সে আগুন প্রচণ্ড আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ঘর-দোর জিনিসপত্র কাঠ-কাটরা, কাপড়-চোপড় দেখতে দেখতে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে উড়তে লাগলো। ভোলানাথ কিছু কিছু বাঁচাবার চেষ্টা করলো কিন্তু সে আগুনের ভেতর গিয়ে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই করা চলে না। দোকানের মালিক তখন বালির ওপর শুয়ে পড়ে কেঁদে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

রাত কোনো রকমে কাটল। পরদিন দিনের আলোয় দেখা খানকয়েক আধপোড়া কাঠের আঙরা ছাড়া অত বড় কাফিখানার আর কোন চিহ্নই নেই। সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে এরই মধ্যে হাওয়ায়

উড়ে গেছে। দোকানের মালিক সেই যে মনের দুঃখে রেল ইষ্টিশানের দিকে চলে গেল আর তাকে দেখাই গেল না।

দুদিনের বাসা ভেঙ্গে গেল। রাত্রে মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত নেই। অনেক দূরে ইস্টিশান কিছু কিছু খাবার কিনতে পাওয়া যায়, সেইখানে গিয়ে ভোলানাথ খেয়ে আসে আর বন্দরের জেঠীতে এসে একটি পাশে শুয়ে রাতটি কাটিয়ে দেয়। জাহাজ ভিড়তে আবার কাজে লেগে যায়। এমনি করেই দিন চলে।

কিন্তু দিন আর চলে না; নিয়তির বিরুদ্ধে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টায় ভোলানাথ দিন দিন ক্লান্ত হয়ে উঠলো। মনে হলো, মরণ তার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব নয়; কোনো একদিন রাত্রিতে সে যদি সমুদ্রের মধ্যে পথ কেটে চলে যাবার চেষ্টা করে তাহলে কেউ তাকে বাধা দেবার নেই। চুপি চুপি একাকী গভীর সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে নিঃশব্দে সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে। কিন্তু দুঃখ সয়ে সয়ে নিজেকে সে ভাল বেসেছিল, মরতে তার ইচ্ছা হলো না। বিশেষত দিন দুই বাদে যে ঘটনাটী ঘটলো তাতে তার জীবনের গতি একেবারে অন্যদিকে ঘুরে গেল।

অস্থায়ীভাবে জাহাজের যে কাজটা তার ছিল, সে কাজ আর রইল না। মালের হিসাবে কি একটা ভুল করাতে কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তাকে ছাড়িয়ে দিল। এবার সে সত্যিই নিঃসম্বল। যে টুকু আশ্রয় ছিল তাও ঘুচে গেছে। সেই বাবুটীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো কিন্তু তিনি আর এলেন না। ঠিক এমনি সময়টায় একজন তীর্থযাত্রীর দেখা পাওয়া গেল। সমুদ্রের এই মোহানার বহুদূর ওপারে কোথায় রাধা-গোবিন্দজির মন্দির আছে তারা সেইখানে যাবে। প্রকাণ্ড মেলা নাকি সেখানে বসে। যাত্রীরা সবাই বাঙালী—মেয়ে পুরুষ উভয়ই তাদের মধ্যে ছিল। শুধু তাই নয়, ছোট্ট একটি শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে একটি অল্পবয়সী বিধবা মেয়েও ছিল সকলের সঙ্গে।

এদিকের পথঘাট ভোলানাথ কিছু কিছু জানতো সুতরাং

পরিচয় হবার পর সে দলের মধ্যে ভিড়ে গেল। বেলা তখনও কিছু অবশিষ্ট আছে, বড় বজ্‌রা নৌকোর বন্দোবস্ত হলো। সমুদ্রের বাঁক পার হয়ে যেতে হবে,—প্রায় সাত ক্রোশ জলপথ। সবারেই ভয় হচ্ছিল, নৌকোয় করে সমুদ্র পার হওয়া এক ভয়ানক ব্যাপার। অথচ এ ছাড়া আর উপায় নেই। পাড়ের ওপর থেকে ধরাধরি করে সবাই বজরায় নামলো। বিধবা মেয়েটিও ছেলে কাঁকালে করে নেমে এল। একজন মাঝি আর চারজন দাঁড়বাহী—তারাও নিজের নিজের জায়গা করে নিল। বজ্‌রার মুখ ফিরিয়ে সমুদ্রের মধ্যে সবাই রওনা হল। হাল আর পাল—এ দুটি যদি ভাল হয় তা হলে বিশেষ কোনো ভয় নেই। সমুদ্রও ছিল শান্ত। দিনান্তের আলো পড়েছে জলের ওপর—ভোলানাথ সেইদিকে চেয়ে চুপ করে বসে ছিল। শিশুপুত্রটি সেই বিধবার কোলে বসে কাঁদছিল—মেয়েটি তাকে শান্ত করছে। জনকয়েকের এরই মধ্যে সামুদ্রিক পীড়া ধরে গা বমি বমি করছিল।

কিন্তু সন্ধ্যার সময় সমস্ত চেহারাটাই বদলে গেল। কোথা থেকে মেঘ এসে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেল্‌লো, প্রবল বেগে হাওয়া বইতে সুরু করে দিল, সমুদ্র গর্জন করে ভেতর থেকে ফুলে উঠলো। জলে-আকাশে আর ঝড়ে একেবারে যেন প্রলয় সুরু হয়ে গেল। ভোলানাথ ভাবলো—এ কি! এমন রূপ ত তার চোখে কোনোদিন পড়েনি।

মেয়ে-পুরুষ সবাই দেবতার উদ্দেশে চীৎকার করে ডেকে কাঁদতে সুরু করে দিল, অনেকে অনেকে মানৎ করলো, অনেকে ভয়ে কণ্ঠরোধ হয়ে চুপ করে রইল। অত বড় বজ্‌রাখানা যুদ্ধের ঘোড়ার মত ঢেউয়ের ওপর লাফাচ্ছিল। নৌকোর যাত্রীরা সবাই এ ওর ঘাড়ে পড়ে এক একবার তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মাঝি মাল্লরাও ভয় পেয়ে নানা কথা বলাবলি করছে। কিন্তু হায়, নিরপরাধ নিষ্পাপ প্রাণীরাই চিরদিন এ সংসারে শাস্তি ভোগ করে। বিধবা মেয়েটি তার

ছোট্ট শিশু সন্তানটিকে এতক্ষণ বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে বোধ করি তার স্বর্গত স্বামীর নামই উচ্চারণ করছিল—হঠাৎ ঢেউয়ের একটা ধাক্কায় নৌকোটা এমন দুলে উঠলো যে টাল্ সামলাতে না পেরে সেই মেয়েটি নিজের শিশু সন্তানটিকে নিয়েই টপ্ করে জলে পড়ে গেল। ভোলানাথ একবার সেদিকে চেয়ে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো, তারপর আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়্লো।

অন্ধকারে আর কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। নৌকোর অন্যান্য যাত্রীদের ভাগ্যে কি ঘট্লো তাই বা কে বলতে পারে!

ভোলানাথ পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সাঁতার ভালই জানতো। তলিয়ে গিয়ে শিশুটিকে সে ধরে ফেলেছিল কিন্তু তার মায়ের আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

* * * *

যখন জ্ঞান হলো, ভোলানাথ দেখলো সমুদ্রের চড়ার কাছে সে শুয়ে আছে। পায়ের কাছে বড় বড় ঢেউ এসে লাগছে। মাথার কাছে শিশুর দেহটি বালিতে একেবারে মাখামাখি,—বেঁচে আছে কিনা কে জানে! ভোলানাথ উঠলো, গায়ে ভয়ানক ব্যথা। চারদিকে সূর্যের আলো ঝক্‌ঝক্ করছে। উঠে শিশুটিকে কোলে তুলে দেখলো, কোনো সাড়া নেই। একেবারে মরে গেছে তা মনে হলো না! এর মা কোথায়! সেই বজ্‌রা! সেই যাত্রীর দল! ভোলানাথ যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। কেউ কোথাও নেই—যেদিকে দেখা যায়—আকাশ প্রান্তর আর সমুদ্র! জলে ভাসতে ভাসতে এ কোথায় এসে সে ঠেকেছে? এদিক ত তার জানা নেই! কিন্তু এই শিশুটিকে যে বাঁচাতেই হবে! ভিজা কাপড়ে উঠে ছেলেটিকে আবার কাঁধে নিয়ে সে এক দিকে চলতে লাগলো। কিন্তু কোথায়—কোন্ পথে! 'এ পথ ত তার জানা নেই! কতদূরে গিয়ে এ পথ মিলিয়ে গেছে! সমুদ্রের জল লেগে দুজনের গায়ে নুন ফুটে উঠে সারা গা চিড়্ 'চিড়্ করছে!

ভোলানাথ পরম যত্নে ছেলেটির গা থেকে নুন ঝেড়ে দিতে লাগলো। পরে তার ছোট্ট বুকটির ওপর কান পেতে শুনতে লাগলো—ভেতরে তখনও ধুক ধুক করছে। কিছু খাওয়ালে নিশ্চয় বেঁচে উঠবে! কিন্তু—

ভোলানাথ থমকে দাঁড়ালো! একে বাঁচিয়ে কি লাভ! অসহায় একটি শিশু, সংসারে ত এর কেউ নেই। যদি বেঁচে ওঠে তাহলে তার মতই ত দুঃখ পাবে! তা হোক, দুঃখ পাওয়াটাই ত পৃথিবীতে একমাত্র সত্য! একথা ভোলানাথের চেয়ে আর কে এত বেশী জানে! আবার সে চলতে লাগলো। বালির ওপর দিয়ে পথ চলা বড় কঠিন! অনেক পথ হেঁটে এসেও মনে হয়, কিছুই আসা হয়নি। সর্বাঙ্গ অবশ, হাত পা কাঁপছে—গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু দুধ কোথায় পাওয়া যায়? এ শিশুটি কি সত্যিই আহারের অভাবে মারা যাবে? শিশুটি এবার একটু একটু নিশ্বাস ফেলছে, হাত পা মাঝে মাঝে নাড়ছে। ভোলানাথ ছুটে ছুটে চলতে লাগলো। একে না বাঁচাতে পারলে সে যেন পাগল হয়ে যাবে! সত্যিই পাগল হয়ে যাবে—ছেলেটিকে তার বাঁচানো চাই।

মাথার ওপর রোদ উঠলো; ছেলেটি নড়ে চড়ে একটুখানি কেঁদে উঠে আবার কাঁধের ওপর ঝিমিয়ে পড়ছে। ভোলানাথের ইচ্ছা হলো ওপর দিকে চেয়ে চীৎকার করে বলে—ভগবান! এর দিকে চেয়েও আজ তুমি আমায় সাহায্য কর। আর কোনোদিন তোমার কাছে কিছুই চাইব না! কাঁধ থেকে নামিয়ে আর একবার সে ছেলেটিকে ভাল করে দেখলো, দেখে শিউরে উঠলো—তারপর সে আবার ছুটতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একবার পা মচকে সে বসে পড়লো। তীব্র যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গ একেবারে সিটিয়ে উঠলো; মাথার মধ্যে সব অন্ধকার। আবার সে উঠলো, উঠে আবার ছুটতে লাগলো। মুখখানা তার নীল হয়ে উঠেছে, চোখদুটো তীব্র জ্বালায় আর বেদনায় আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে। বিধাতাকে সে যেন আর মানবে না, সৃষ্টির এই অনিয়মের বিরুদ্ধে সে যেন এবার প্রচণ্ড একটা বিদ্রোহ করে আকণ্ঠ চীৎকারে কেঁদে উঠবে।

হঠাৎ বহুদূরে যেন অস্পষ্ট মানুষের ছায়া দেখতে পাওয়া গেল। এত দূরে যে সহসা নজর চলে না। ভোলানাথ আশায় আর আনন্দে একেবারে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলো। আনন্দে সেই নির্জীব শিশুটির গায়ে বার কয়েক চুম্বন করে নিল।

উটের পিঠে চড়ে কয়েকটা লোক বোধকরি কোনো শহরের দিকে চলেছে। ভোলানাথ তাদের দিকে চেয়ে চীৎকার করে হাত তুললো কিন্তু অত দূর থেকে তারা দেখতেও পেল না। সে আবার দৌড়ল। এবার একেবারে শেষ চেস্টা, নৈলে ওরা হাতছাড়া হয়ে গেলে দুজনের কারো বাঁচবার আশাই আর নেই।

ভগবান বোধ করি মুখ তুলে চাইলেন। উটের দল একবার যেন থমকে দাঁড়ালো মনে হচ্ছে। ভোলানাথ তখনও ছুটছিল। সে যেন একেবারে উচ্ছৃঙ্খল বাঁধনহারা। এবার গিয়ে যেখানে থামবে আর নড়তে পারবে না। ছেলেটিকে তখনও সে আঁকড়ে ধরে আছে। তারপর পথ অবশ্য ফুরিয়ে এল। উটের রক্ষকরাও তার দিকে ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোলানাথ যেতে পারলো না কাছাকাছি এসে এক জায়গায় ছেলেটিকে নিয়ে বসে পড়লো।

লোকজন ছুটে এসে তাদের দুজনকে যখন ধরাধরি করে তুললো ভোলানাথ অতি কষ্টে তখন বললো—একটু দুধ! আর কিছু চাইনে!

উটের দুধ অবশ্য তাদের কাছে পাওয়া গিয়াছিল।

অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর বাচ্চা শিশুটি কোনোরকমে বেঁচে উঠলো। একজনের প্রাণরক্ষা করায় যে কত বড় অধার আনন্দ তা এবার ভোলানাথ বুঝতে পারলো। যাই হোক, শেষকালে ঠিক হলো, লোকগুলি তাকে ও শিশুটিকে উটের পিঠে চড়িয়ে সেই বহুদূর শহরে পৌঁছে দেবে। তারপর ভোলানাথ নিজের পথ নিজেই বেছে নেবে। কথাবার্তার পর দেখা গেল, ছোট শিশুটি মিট্‌মিট্‌ করে চাইছে।

এর মধ্যে একবার কেঁদে উঠেছিল। পা গুটিয়ে একটা উট বসতেই ছেলেটিকে কাঁধে নিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে সে তার পিঠে বাঁধা ছইয়ের ওপর উঠে বসলো। উটটা আবার উটে দুলে দুলে চলতে লাগলো। রক্ষাগুলো তখন সবাই একসঙ্গে গান ধরেছে। সেদিন রাতে প্রান্তরের মাঝখানে কয়েকটা গাছের কাছে উটগুলো বেঁধে সবাই বিশ্রাম করেছিল।

* * * *

কি একটা অজানা সহরে এনে ভোলানাথকে ছেড়ে দেওয়া হলো। খানকয়েক দোকান, কয়েকটা কাফিখানা, দু একটা বাজার, খানকয়েক পুরানো কালের ভাড়াবাড়ী আর অল্পসংখ্যক লোকজন—এই নিয়ে শহর। শিশুটিকে কাঁধে নিয়ে ভোলানাথ সারাদিন ঘুরলো—কোনো রকমে সেদিন কিছু খাবার সংগ্রহ করেছিল।

দিনের বেলা এমনি করে সে ঘোরে, আহার সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে আর রাত্রে শহরের প্রান্তে একটি আস্তাবলের পাশে এসে শোয়। কোচোয়ানটার সঙ্গে তার একটু আলাপ হয়েছিল। শিশুটিকে নিয়ে অনেক দুঃখই তাকে সইতে হচ্ছে। দিনের বেলা পাছে রোদ লেগে অসুখ করে এজন্যে শিশুটিকে সহিসের কাছে রেখে সে ঘুরতে বেরোয় মাঝে মাঝে একবার এসে দুধ খাইয়ে যায়। একটি গোয়ালার বাড়ীতে গিয়ে সে খড়ের জাব কেটে দিয়ে আসত। নিজের খাবারের কোনো ঠিক ছিল না—কখনও জুটতো কখনও জুটতো না। সন্ধ্যার আগেই আস্তাবলে ফিরে এসে তাকে টাটু ঘোড়ার দানা যোগাতে হতো। নিজে সে কিছু রোজগার করবার জন্য একটা তামাকের দোকানে হিসাবের খাতা লেখবার কাজ নেবে ঠিক করছিল—কিন্তু বিদেশী লোককে তারা কাজ দেবে না। অথচ সামান্য কোনো একটি কাজ যদি সে না পায় তাহলে নিজেই বা বাঁচে কি করে? উপবাস করে কদিন আর চলে!

কিন্তু তার সব সমস্যার সমাধান হয় যদি সে একটি সর্তে রাজী

হয়ে যায়! ছোট্ট ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটি দেখে কোচোয়ানের ভারি পছন্দ হয়েছিল। কিছু টাকার বদলে সে যদি শিশুটিকে বিক্রী করে তাহলেই সব দিক রক্ষা হয়। আর এতে কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে অথচ ছেলেটিকে মানুষ করে তুললে ভবিষ্যতে তার যে কোনো সুবিধে হবেই এমন কোন কথা নেই! আর ওইটুকু ছেলে এত কষ্টের মধ্যে না-ও বাঁচতে পারে! বরং বিক্রী করে দিয়ে টাকা কিছু পেলে ভোলানাথের বেশ একটুখানি সুবিধেই হয়ে যায়। না কি বল হে ছোক্‌রা?—কোচোয়ান তার মুখের দিকে তাকালো।

ভোলানাথ রাজী হলো না।—তাই কি আর কেউ হয়? রাত্রিতে না হয় আস্তাবলে শুতেই দেয়, তা বলে সেই সামান্য উপকারটুকুর বদলে এই দুঃখের বন্ধুটিকে ত্যাগ করতে হবে? সে শুধু স্বার্থের জন্যই শিশুটিকে বাঁচিয়েছে?

ছেলেটিকে কাঁধে চড়িয়ে ভোলানাথ আবার পথে এসে দাঁড়ালো। যাবার মত জায়গা, আশ্রয় পাবার মত স্থান আর কোথাও নেই।

আবার সে শহরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কাজকর্ম কিছুই জোটাতে পারে না। নিজের জন্য যদি বা কোথাও একটু সুবিধে হয় ছেলেটির ভার কেউ নিতে চায় না। কারো কাছে শিশুটিকে রেখেও ভোলানাথের বিশ্বাস হয় না—কেউ পাছে আর ফিরিয়ে না দেয়। এক রকম অনাহারেই দিন কাটতে লাগলো।

একদিন হঠাৎ সে চুরি করে বসলো। সামান্য কয়েকটা পয়সার লোভ সে সামলাতে পারলো না। একটা দোকানে গিয়ে কথা কইতে কইতে হাত সাফাই করলো। সেই পয়সায় দুধ কিনলো, খাবার কিনলো। নৈলে বাঁচবার উপায় তার যে আর কোনোদিকেই ছিল না! পাপ সে জীবনে কোনোদিন করেনি—শিশুটি যদি সঙ্গে না থাকতো তাহলে এ কাজ সে কোনোদিন করতো না। শিশুটিকে বুকের ওপর রেখে সমস্ত রাত সেদিন সে কাঁদতে লাগলো। সে যেন আত্মহত্যা করেছে! তাকে এই বেয়াড়া ভবঘুরের জীবন যাপন

করতে দেখে কয়েকটা সমবয়সী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গীও জুটে গেল। তারাও দিনরাত রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, এখানে ওখানে বসে আড্ডা দেয়—নিজেদের মধ্যে ঝগড়া পাকিয়ে সময় কাটায়। ভোলানাথকে তাদের বেশ লাগলো। নিজেদের মধ্যে সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে তারা বেশ আনন্দ পেলে। কেউ কেউ কিছু সাহায্যও করলো। তাদের মধ্যে চোর বদমাইস গাঁটকাটাও ছিল। দু একজন আবার আরো ভয়ংকর। মাঠের মাঝখানে কোনো পথিককে ভয় দেখিয়ে কিছু আদায় করে নেয়। রোজগার যখন তারা করে তখন বেশ মোটামুটিই করে।

দেখতে দেখতে ভোলানাথের জীবন অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে এল। চুরি সে করতে পারতো না বটে কিন্তু চোরাই মাল তাকে নিজের জিম্মায় প্রায়ই রাখতে হতো। সে অনেক আপত্তি করেছে, অনেকবার এড়িয়ে গেছে কিন্তু খাওয়ার অভাব তাকে সব কিছুই সহ্য করিয়েছে। অবশ্য এখন তার খাওয়া আর থাকার একটা সুবিধে হয়ে গিয়েছিল। বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী কোথাও গেলেই খুব খাতির পেতো। বিশেষত তার শান্ত মুখখানার দিকে চেয়ে অনেকে একটু স্নেহ আর সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকে স্থান দিতো। ছোট শিশুটি আজকাল হাত পা নেড়ে তার সঙ্গে খেলা করে,—হাসে। কাছে বসিয়ে দিলে ঝাঁপিয়ে কোলে আসে কিংবা দুহাতে তালি দেয়। শিশুটি বড় হলে যে একজন সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠবে, একথা ভোলানাথ এরই মধ্যে বিশ্বাস করে। মা অভাবে ছেলেটি যে তার হাতে বেঁচে আছে, তাকে যে পরমাত্মীয়ের মত চিনেছে—এজন্য মাঝে মাঝে তার চোখে জলও আসে। গোপনে গোপনে ভগবানকে অসীম ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা জানায় যে, তার এই হীন চৌর্যবৃত্তি আর জীবনের প্রতি মিথ্যাচারকে তিনি যেন ক্ষমা করেন। কুসঙ্গের সঙ্গে এই যে সে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করছে,—এ শুধু বেঁচে থাকার জন্যে। নৈলে এসব কিছুই তার ভাল লাগে না। শিশুটি ঘুমিয়ে পড়লে সে আবার বেরোয়—যদি কোথাও কিছু একটা কাজ মিলে যায় তাহলে এই দুশ্চরিত্রদের হাত এড়িয়ে সে

অন্য কোথাও চলে যেতে পারে। কিন্তু এই দূর দেশে কোনো সুবিধেই তার হলো না। ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু এই দরিদ্র শহরে কে তাকে ভিক্ষা দেবে? দিন কয়েক একটা ঝাঁকা মাথায় নিয়ে সে কুলাগিরি করতে লাগলো, কিন্তু সময়ে দেখাশোনার অভাবে একদিন হঠাৎ ছেলেটির জ্বর হয়ে পড়লো। অনেক সেবা, অনেক যত্নের পর অবশ্য ছেলেটি ভাল হয়ে উঠেছিল।

ক্রমে সে দেখলো তার সঙ্গীরা এক একটি পাকা চোর। আত্মীয়-স্বজন সবাই তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। জীবনে উন্নতি করবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে তারা অতি সহজে বড়লোক হবার চেষ্টায় এই চুড়ি ডাকাতি ধরেছে। বড়লোক তারা অবশ্য কোনো দিনই হতে পারেনি, শুধু এইগুলো তাদের এক একজনের পেশা হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভোলানাথ অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল—চুরি করে এই যে আত্ম-অপমান এ আর সে সহ্য করতে পারছিল না। সে কোথাও পালিয়ে যেতে চায়—কোনো দূর দেশে কিংবা নিজের সেই পল্লীগ্রামে এই শিশু-বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সে পাঁচ-জনের মত সহজ জীবন যাপন করবে—এই ছিল তার একান্ত ইচ্ছা! কিন্তু হায়, এ ইচ্ছা তার আর কাজে হয়ে উঠলো না।

যাবার সমস্ত বন্দোবস্তই সে গোপনে গোপনে করেছিল, হঠাৎ আগের দিন রাত্রিতে দেখা গেল তার সেই ডেরাটির চারপাশে পুলিশ ঘেরাও করেছে। বড় বড় মশাল হাতে নিয়ে পুলিশের কর্মচারীরা ভেতরে ঢুকে সমস্ত আবিস্কার করে ফেললো। ভোলানাথ একটি কথাও বলতে পারলো না, সে তখন ছেলেকে বসে বসে আদর করে খাওয়াচ্ছিল। লোকজন ঢুকে তন্ন তন্ন করে চারদিক থেকে নানারকম জিনিষপত্র অস্ত্রশস্ত্র বের করে ফেললো। ভোলানাথ কোন বাধাই দিল না। বরং লোকগুলি তাকে ভয় দেখাতে সে অনেক গোপন স্থান নির্দেশ করে দিল। আসামী একজনকেও পাওয়া গেল না, আগেই সবাই সরে পড়েছিল। জিনিসপত্র টাকাকড়ি, আরও নানা মূল্যবান

সামগ্রী নিয়ে বাবার সঙ্গে ভোলানাথকেও তারা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে গেল। শিশুটিও গেল তার কাঁধের ওপর।

কোন একটা জেলায় ভোলানাথকে চালান দেওয়া হয়েছিল, সেইখানেই কয়েকদিন হাজতে থাকবার পর বিচার হলো।

বিচার হলো ভোলানাথের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড!

তা হোক, কিন্তু বিচারাগারে যে দৃশ্যটি ঘটলো সেটি বড় করুণ! শাস্তি হয়েছে ভোলানাথের সুতরাং শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া চলতে পারে না। পাপের শাস্তি শুধু সেই ভোগ করবে, শিশুর স্থান তার কাছে কোথায়? শিশুটিকে যখন তারা ভোলানাথের কাছ থেকে কেড়ে নিতে এল তখন সে আর কিছুতেই সামলাতে পারলো না। জীবনে কোনোদিন সে যা করেনি, আজ তাই করলো,—চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। কিন্তু নির্দয় রাজ-প্রতিনিধির হৃদয় তার কান্নায় এতটুকু টললো না। এতদিন ধরে এত দুঃখে যে তাকে মানুষ করেছে তাকে যে আজ নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিনে এমন করে ছেড়ে যেতে হবে—একথা ভোলানাথ জানতো না। ছোট শিশুটিও ভয় পেয়ে কাঁদছিল, ভোলানাথ তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে নিঃশব্দে বোধকরি শেষ বিদায় জানাচ্ছিল।

এই সামান্য ব্যাপারে সময় নষ্ট করবার মত সময় কারো ছিল না, কয়েকজন লোক এসে ছেলেটিকে ভোলানাথের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তাকে বুঝিয়ে বললো কোনো চিন্তার কারণ নেই—শিশুটিকে কোনো একটি অনাথ-আশ্রমে মানুষ করতে দেওয়া হবে। তা ছাড়া ছেলেটি যখন তার কোনো আত্মীয় নয় তখন আইনত তার ওপর ভোলানাথের এমন কিছু দাবি দাওয়া থাকতে পারে না। মানুষের মনের খবর নিতে আইন মাথা ঘামায় না, কাজেই ভোলানাথের চোখের জল ব্যর্থই হলো!

কাঠগড়া থেকে ধরাধরি করে ভোলানাথকে জেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল, কারণ—তখন আর তার জ্ঞান ছিল না।

কিন্তু ভাগ্য ভোলানাথের একটু সুপ্রসন্ন ছিল বোধ হয়। পূরো এক বছর তাকে মেয়াদ খাটতে হয়নি। কঠিন রোগে আক্রান্ত হতে মাস কয়েক পরে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে কোথাকার হাঁসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। বাঁচবার বিশেষ আশা ছিল না। কিন্তু রোগমুক্ত হলে দেখা গেল, তার মাথার একটু দোষ হয়েছে।

হাঁসপাতাল থেকে বরখাস্ত হয়ে সে রাস্তায় নেমে এল। আর আর তাকে চেনা যায় না। শীর্ণ কালো কদাকার চেহারা, মুখখানা ঘৃণায় আর নির্দয়তায় একেবারে কঠিন, চোখদুটি অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ—দেখলে যেন একটু ভয় করে। কিন্তু এবার সে কোথায় যাবে কে জানে!

রাস্তায় দু একজনের সঙ্গে দেখা হতে সে শিশুটির কথা জিজ্ঞেসা করলো। কিন্তু পথের লোক কি জানে! ভোলানাথ তাদের অকারণে তিরস্কার করলো। ক্রমে যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই সে বলে—নিশ্চয় তুমি তার কথা জানো, তোমরা সবাই জানো সে কোথায়—আমাকে বল, আমি তাকে চাই!

কিন্তু উত্তর শোনবার জন্য সে আর দাঁড়ায় না, নিজের মনে এক দিকে চলে যায়।